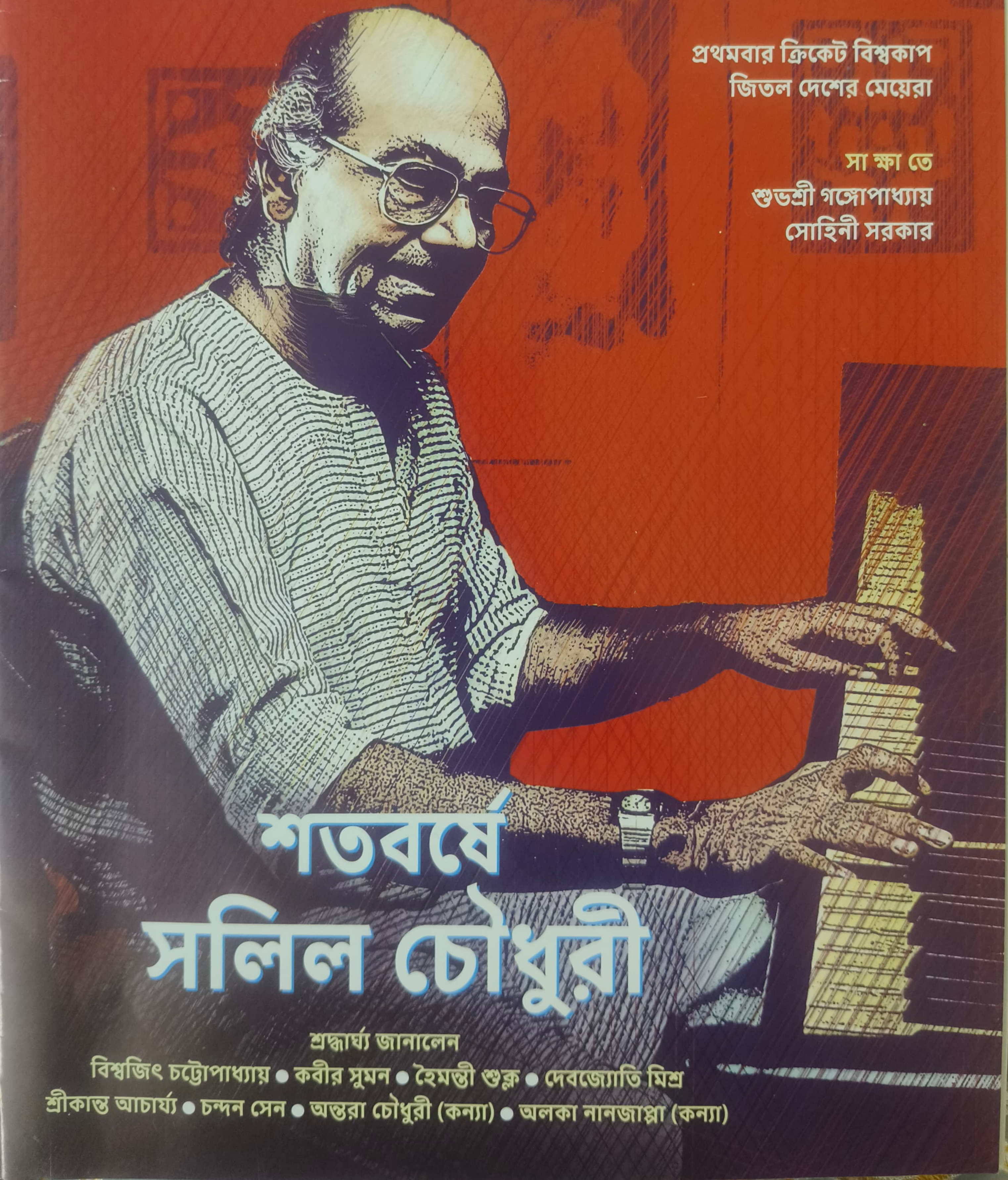
১২ নভেম্বর ২০২৫

আনন্দলোক



প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ
জিতল দেশের মেয়েরা

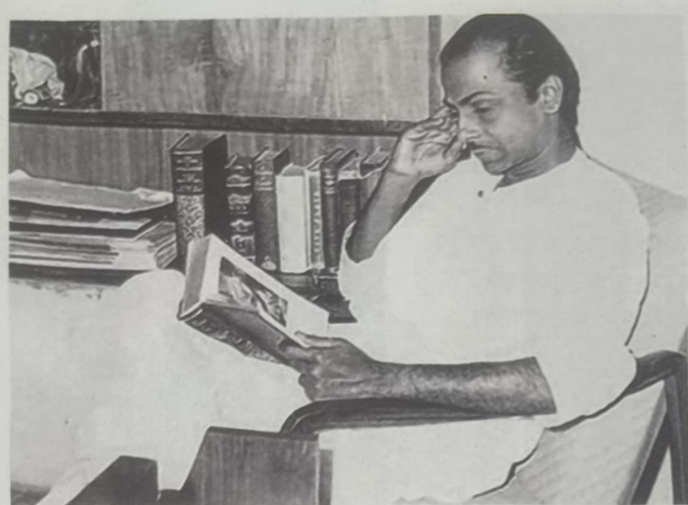
সা ক্ষা তে
শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়
সোহিনী সরকার

শতবর্ষে
সলিল চৌধুরী

শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় • কবীর সুমন • হৈমন্তী শুক্ল • দেবজ্যোতি মিশ্র
শ্রীকান্ত আচার্য্য • চন্দন সেন • অন্তরা চৌধুরী (কন্যা) • অলকা নানজাপ্পা (কন্যা)

আনন্দলোক কোথায় কী
৫১ বর্ষ ২০ সংখ্যা ১২ নভেম্বর ২০২৫

কভার ড্রাইভ



শতবর্ষে সলিল চৌধুরী

সলিল চৌধুরী গীতিকার হিসেবে কেমন? ঘরের মানুষ আর কাজের মানুষের মধ্যে তফাত কতটা? তাঁর জন্মশতবর্ষে স্মৃতিচারণ করলেন পরিবার এবং কাজের ঘনিষ্ঠ পরিসরের মানুষরা। যাঁদের কথায় জীবন্ত হয়ে উঠলেন ব্যক্তি সলিল...

সাক্ষাতে



স্টেডিয়াম

প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল! সেই জয়ের কারিগরদের কাহিনি...

প্রচ্ছদ: সলিল চৌধুরী

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 20th
RNI Regd No. 27039/74



■ ডায়ানা পেন্টি

আরও বিশ্লেষণ

ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের চমক নিয়ে আনন্দলোক প্রতিবারই বেশ ভাল প্রতিবেদন উপহার দেয়। উজ্জ্বল ছবিসহ। এবারও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় পোশাক নিয়ে আরও একটু বিশ্লেষণ করলে ভাল হত। আমার মতো অনেকেই এ বিষয়ে কম বোঝে। তবে লেখনী ভাল। ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রিয়াংশী বর্মন, যাদবপুর



বাবা ও মেয়ে

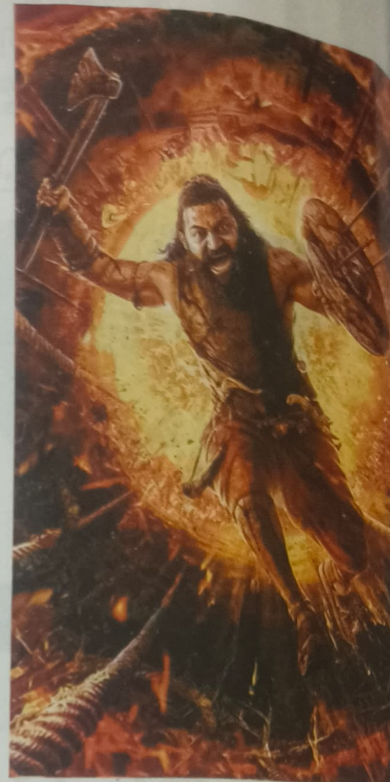
রঞ্জিত মল্লিক এবং কোয়েল মল্লিকের সাক্ষাৎকার পর্বটি ভাল লাগার মতোই। সঙ্গে ছবিগুলো আরও চমৎকার। সাক্ষাৎকারে রঞ্জিত মল্লিক কর্মজীবন নিয়ে বেশ কথা বলেছেন, যা পড়ে অনেক কিছু জানলাম। কিন্তু উনিও অন্যদের মতোই নিজের ছবির প্রচারের স্বার্থে সে সব কথা বললেন। প্রশ্ন, অন্য সময় ওঁর এত খোলামেলা সাক্ষাৎকার কেন পাওয়া যায় না?

দিপ্তি রায়, বহরমপুর

'কান্তারা'র কাছাকাছি

'কান্তারা'র প্রিকোয়েলের শুটিং পর্ব নিয়ে এর আগে কোনও প্রতিবেদন পড়িনি। অন্তত বাংলায় তো নয়। নায়ক তথা পরিচালকের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারলাম। কিন্তু একটাই অনুরোধ, ঋষভ শেট্টির একটা বড় সাক্ষাৎকার যদি আনন্দলোকে পড়তে পারি...

সম্রাট গুহ, বারাসত



■ 'কান্তারা'র প্রিকোয়েলে ঋষভ শেট্টি

অন্যরকম

ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের প্লেয়ারদের নিয়ে খুব কম লেখালেখি হত বরাবরই। আমি আগেও এই নিয়ে অভিযোগ করেছি। আর তাঁদের শরীরচর্চা বা লাইফস্টাইল এসব নিয়ে তো কথা হয়-ই না। তাই এবারের আনন্দলোকে স্মৃতি মন্ধানার ইতি বৃত্তান্ত পড়ে খুশি হলাম। জানলাম অনেক কিছু। আশা করি এর পরে ওঁদের নিয়ে এরকম আরও অনেক প্রতিবেদন পড়ব। সর্বোপরি ওঁদের জয়ের গল্প পড়ব।

বৃষ্টি দেব রায়, তমলুক



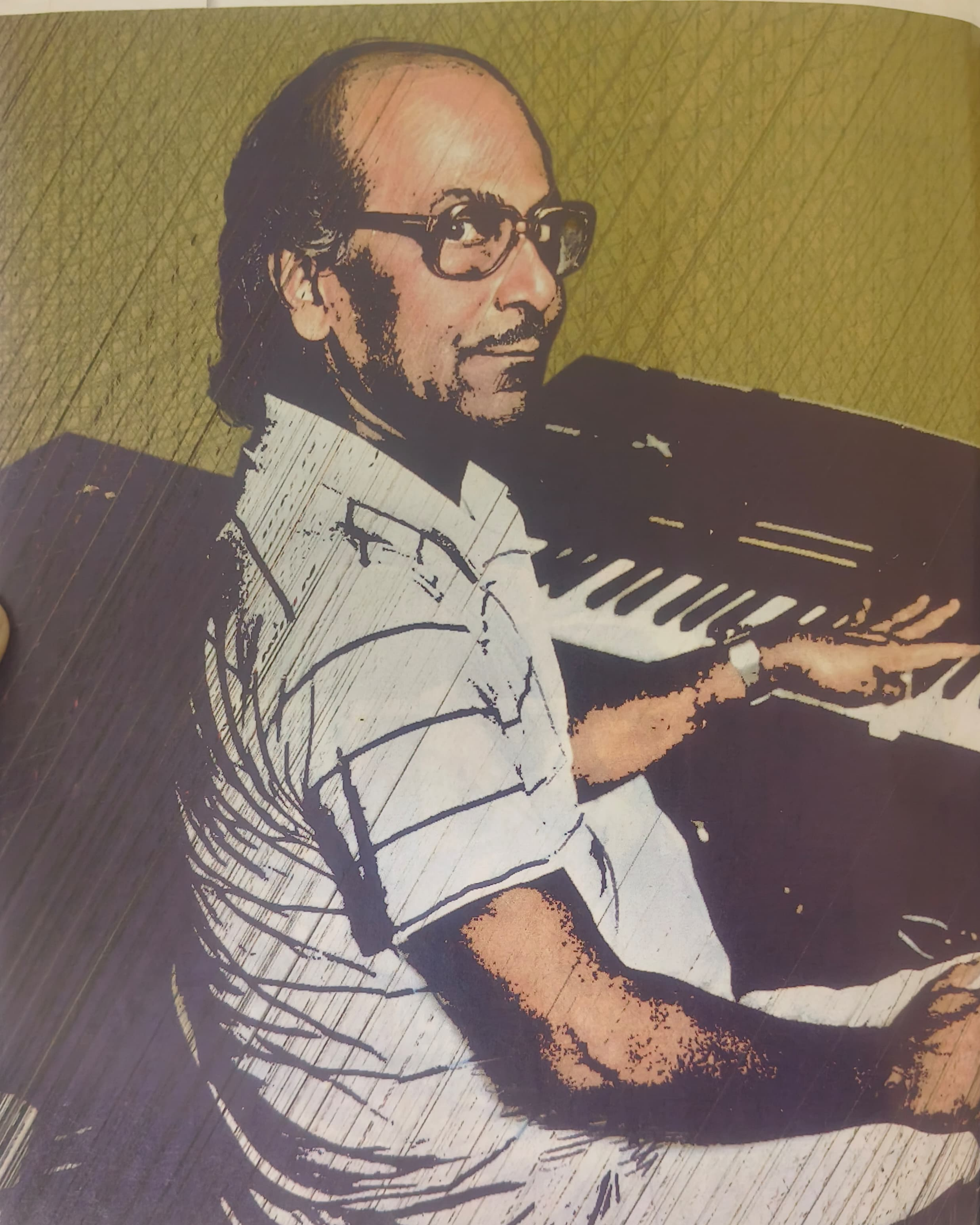
■ স্মৃতি মন্ধানা

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।



■ সেহের বাম্বা

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in





আমার প্রিয় সলিলদা

আমেরিকায় একসঙ্গে থাকতেন তাঁরা। গান-জীবন যাপন করতেন। স্বাভাবিকভাবেই হত ঝগড়া। তারপর... **সলিল চৌধুরী**র জন্ম শতবর্ষে পুরনো গল্পে ডুব দিলেন **কবীর সুমন**

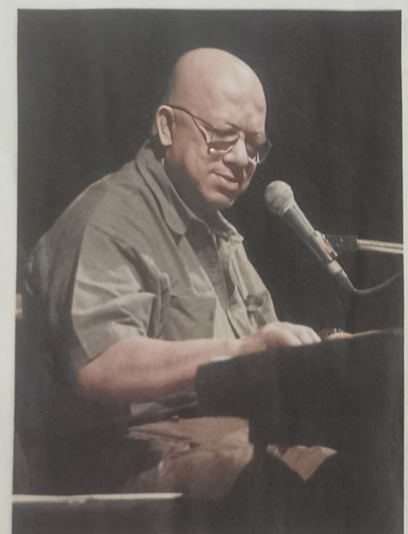
সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ। এই একটি বাক্য আমার মনকে উৎফুল্ল যেমন করছে, স্মৃতিকে করছে আবেগময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলেত যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় কলকাতায় বেথুন সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে বলেছিলেন, 'আমাদের গীতকলায় একটা নতুন অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে এখনও তেমন মতামতের ঘাত প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যতদিন না সেটা হবে, ততদিন এক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয়।'

এই নতুন অভ্যুদয়কে আমরা আধুনিক গান হিসেবে ধরতে পারি। সেই প্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের এই কথার মানে আমি বেশি করে বুঝেছি সলিল চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময়। সলিলদার সঙ্গে কাটানো সময়, ওঁর সঙ্গে করা তর্ক, ঝগড়া ও ঘাত প্রতিঘাতে আমার গান জীবন উন্নত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। আমার কিশোরমন নেচে উঠেছে তাঁর গানে। তবে সলিলদার গান কেন এত উজ্জ্বল হয়ে আছে, তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট উত্তর আমার কাছে নেই। আমি মনে করি, একটি সময়ের সুর তাল ছন্দকে ধরতে পারা শিল্পীর সবচেয়ে বড় কাজ। আজ যদি কেউ কাজী নজরুলের 'ভোরের ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে'র স্টাইলে গান তৈরি করেন, তা হলে সেই গান কেউ শুনবে না। সলিলের মুনশিয়ানা হল, তিনি তাঁর অস্থির সময়ের সুর, তাল, ছন্দকে ধরতে পেরেছিলেন। আমি আমার স্কুল জীবনে থাকতে শুনেছি, 'পালকির গান'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা ও হেমন্তর (মুখোপাধ্যায়) গাওয়া। সলিলের সুর। ওই গানে ছন্দমত্ততার যে উদ্‌যাপন, তা মনে ধাক্কা দেয় বইকী। প্রমাণ হয়, বাঙালি এখানে আর রবীন্দ্রনাথের গানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচছে না। বা ধরুন 'রানার'... সেটাও তো মনে যে অভিঘাত সৃষ্টি, তা ঠিক রাবীন্দ্রিক নয়! আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রভক্ত সলিল চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেই, তাঁর সৃষ্টি তৈরি করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথেরই বক্তব্য, 'গানের কথা শুনিবার জন্য। কবিতার কথা পড়িবার জন্য। এক তুলাদণ্ডে এদের বিচার করা ঠিক নয়।' কিন্তু সলিল এই তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। কবিতার কথাকে সুর ও তালে এমনভাবে মিলিয়ে দিচ্ছেন, যেখানে তা আলাদা করা যাচ্ছে

না। তবে ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান শুনে আসা সলিলের বিভিন্ন লেখায় একটি প্রভাব আমাকে বারবার বিব্রত করেছে। সেই প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

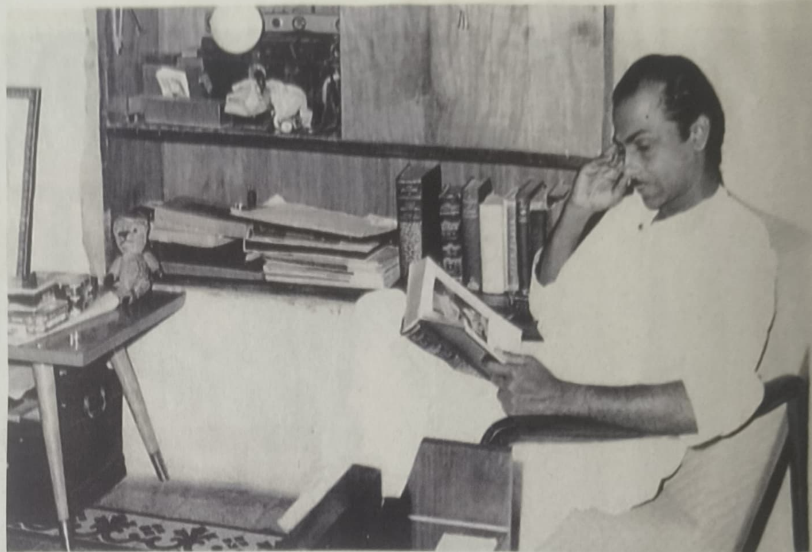
সলিল এবং গুরুচণ্ডালি দোষ

আগে বলি, সলিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার কাটানো সময়গুলোর কথা। আটের দশক তখন। আমার ৩০-৩২ বছর বয়স। ভয়েস অফ আমেরিকায় চাকরি পেয়ে গিয়েছি। ওয়াশিংটনে গিয়ে থাকতে হবে। ওখানে টাকা থাকবে হাতে, সঙ্গে সময়ও। তাই ঠিক করলাম 'আধুনিক বাংলা গানে সমাজতত্ত্ব' বলে একটা বই লিখব। পরে মনে হল, বইটার নাম হতে পারে, 'সলিল চৌধুরী ও আধুনিক বাংলা গান।' কারণ সমসময়কে ধরার ক্ষেত্রে সলিল চৌধুরী ছাড়া আমার আর কারও নাম মাথায় আসেনি। আমি চিঠি লিখলাম ওঁকে। তখন উনি লাউডন স্ট্রিটে থাকতেন। পুরো ব্যাপারটা চিঠিতে লেখা ছিল। উনি রাজি হলেন শুনে। এবং বললেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে আমার কাছে গিয়ে থাকবেন। ওঁর ছেলে থাকতেন



■ কবীর সুমন

নিউ ইয়র্কে। সেখানে কিছুদিন আর আমার কাছে কিছুদিন, এই মর্মে থাকা ঠিক হল। আমি ওই সময় ওঁর কিছু সাক্ষাৎকার নেব, এই ছিল দাবি। সেই দাবি মেটানোর সময় আমি আর সলিলদা ভীষণ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। ওই আলাপ এবং সাঙ্গীতিক আদান-প্রদান ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করল। এবার বলি, কেন আমি বিব্রত হয়েছি সলিলদার লেখায়। উনি আমার কাছে আধুনিকতার বার্তা নিয়ে এসেছেন। কথা-সুর মিলিয়ে। কিন্তু তাঁর লেখা



■ পাঠকসত্তা। (নীচে) কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সলিল



গানের কথায় এমন গুরুচণ্ডালি দোষ থাকবে কেন? উদাহরণ দিয়ে বলি...

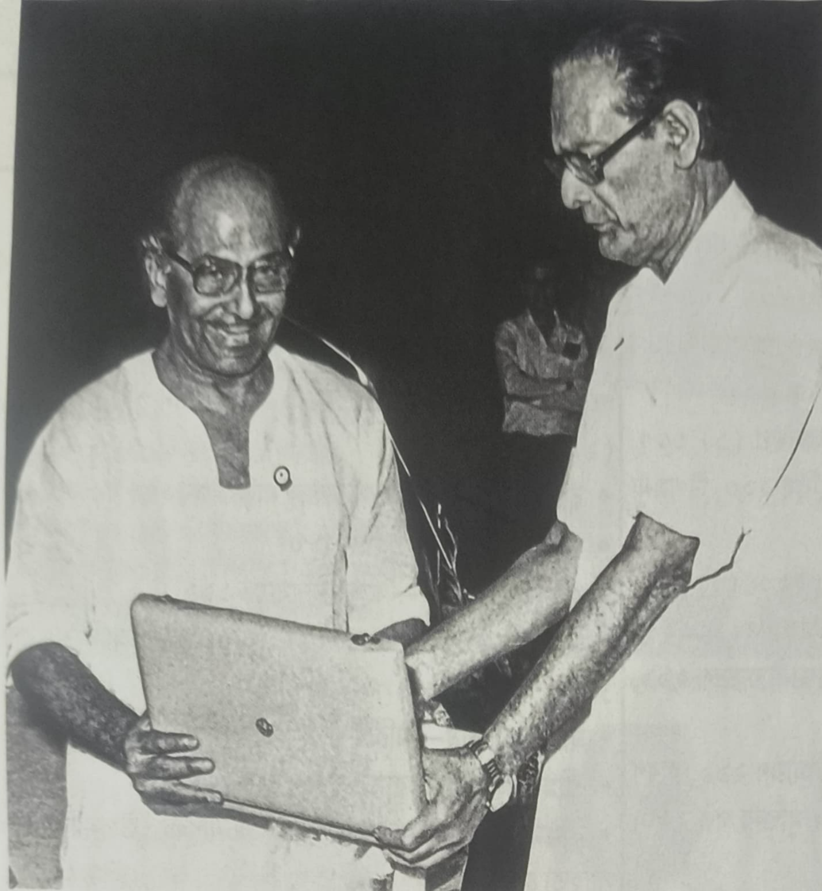
যদি কিছু আমারে 'শুধাও'।
কি যে তোমারে 'কবো'
নীরবে চাহিয়া 'রবো'
না বলা কথা বুঝিয়া 'নাও'...

এই 'শুধাও', 'রবো', 'কবো' শব্দগুলো তো বেশ প্রাচীন! আধুনিক বাংলা চলতি ভাষার গানে সলিল তা ব্যবহার করবেন কেন? এই প্রতিটি জিনিস ধাক্কা দিয়েছে আমার আধুনিক মনে। কেন? আমি তো কথা ও সুরের মিলিত উপস্থিতিতে আধুনিক হতে চাই। কিন্তু এই গানটা কেন হতে দিচ্ছে না! কেন এখানে সাধু ভাষার ব্যবহার? তা হলে এই আধুনিকতায় সলিল কোথায়? থেকেও কি নেই? কথাটা শুনে অনেকে রেগে যেতে পারেন, কিন্তু ভেবে দেখবেন বন্ধুরা আমি ঠিক বলছি কি না।

গানটির অনবদ্য সুর ও সঙ্গীতায়োজন মানব মনে আনন্দের সৃষ্টি করে। আমি নিজেও এসব সৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু সলিলদা শুধু শোনায় বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, "বুঝলি তো সুমন, এখনও অনেকেই আমাকে আমার অমুক গান ভাল লাগল বা লাগল না, তা নিয়ে বলে। মানে যে গান কানে শুনতে ভাল, সেটাই যেন ভাল। কানই যদি ভাল শ্রোতার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তা হলে তো গাধাই সবচেয়ে বড় শ্রোতা, তাই না? কারণ তার কান সবচেয়ে বড়।"

আমি এই কথার সূত্র ধরে ওই গুরুচণ্ডালি দোষের প্রসঙ্গটা ওঁর কাছে তুলি। উদাহরণ হিসেবে বলি, আরও একটি গানের কথা। সুবীর সেনের গাওয়া গানটিতে সলিলদা লিখেছিলেন,

'আর কিছু স্মরণ নেই, চলন তার ছন্দ বাঁকা।
দুই চোখে অপলকে দিগন্তে চেয়ে থাকা,



সলিল ও হেমন্ত, একমঞ্চে

যত দূর 'চাহি'।
আর কিছু 'নাহি'
শুধু শুনি ছম ছম ছম আর দু'নয়ন তার শূন্যে আঁকা।'

আমি সলিলদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এটা কী হল?" সলিলদা প্রথমে মানতে চাননি এই গুরুচণ্ডালি দোষের কথাটা। ভীষণ তর্ক হল। কিন্তু পরে গাইতে গিয়ে বুঝেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন, "তুই কেন আগে এলি না আমার জীবনে? তোর আগে তো কেউ এভাবে বলেনি আমাকে!" আমি বলেছিলাম, "ওমা! আমি কেন বলব? আপনার মাথায় আসবে না? আসলে আপনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এত বেশি শুনেছেন যে, এটা আপনার লেখায় থেকে গিয়েছে।"

সেই যে সলিলদার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল, সেটা থাকল শেষদিন পর্যন্ত। কত যে গল্প শুনেছি ওঁর কাছে! অনেকে জানেন না, সলিলদা দুর্দান্ত বাঁশি বাজাতে পারতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সলিলদা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিকের দ্বারা। তবে আমার মত, সলিলদার সাঙ্গীতিক জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর। উনি কিন্তু জন্মেছেন বুর্জোয়া সমাজে। বাবার সংগ্রহ করা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড শুনে নিজেকে তৈরি করেছেন। মামাবাড়িতে অর্কেস্ট্রা শুনে সুর-তাল-ছন্দ বুঝেছেন। অথচ এই মানুষটাই কি না, সারা জীবন শ্রমিক, কৃষক শ্রেণির জন্য গান তৈরি করে গেলেন। সেটা সম্ভব হল, কমিউনিজ়মের প্রতি ওঁর অগাধ আস্থার কারণে। বিশ্বাস করতেন মনে প্রাণে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময়, চারের দশকে বাংলায় খুব বড় একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে। সেই দুর্ভিক্ষের জন্য সলিলদা ত্রাণ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন। গল্প করতে-করতে বলেছিলেন, "দেখেছিলাম গ্রামের পর গ্রাম খালি! কোনও বাড়িতে কোনও লোক নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। মৃতদেহ পোড়াতে পারেনি বলে রেখে গিয়েছে মানুষজন। এবং সেই কঙ্কালের হাড় ফসফরাসের মতো জ্বলছে! দূর থেকে মনে হচ্ছে আগুনের মরীচিকা।" সলিলদা তারপরেই লেখেন, 'গাঁয়ের বধূ' গানটি। এবং দশ বছর পরে তৈরি করেন 'প্রান্তরেরই গান আমার, মেঠো সুরের গান আমার।' এই নির্দিষ্ট দুটো গানের কথা কেন বললাম? ভেবে দেখুন বন্ধুরা, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে তৈরি এই গানের মাধ্যমে সলিলদা কিন্তু 'ঘরে' ফিরলেন। যেখানে মাঠে ময়দানে দুর্বার পদচারণার দরকার ছিল, দরকার ছিল পথের সাথীকে চিনে নেওয়ার, সেই জায়গা থেকে সরে এসে সলিলদা লিখলেন,

"একটুখানি শ্যামল ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শীষের ইশারাতে
দিবাশেষে কিষাণ যখন আসত ফিরে
ঘি মৌ মৌ আমকাঁঠালের পিঁড়িটিতে বসত তখন
সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে কিষাণী সেই
কাহিনী শোনাই শোনো..."

আদতে বাড়ি ঘিরে গড়ে ওঠা রমণীদের স্বপ্ন ধরলেন তিনি। গানে নৃত্যশীলতা একই থাকল। তবে সলিলের গান মাঠ ময়দান থেকে বাড়িতে এল। এ যেন তাঁর অন্য রূপ! লেখার শুরুতে যে ঘাত প্রতিঘাতের কথা বললাম, সেই বিশ্লেষণগুলো কিন্তু উঠে এসেছিল সলিলদার সঙ্গে আমার কথোপকথনের মাধ্যমেই। মতানৈক্য ভীষণ হত। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা এত চরমে পৌঁছত যে, সেটাকে সাদা বাংলায় ঝগড়া বলে। দু'জনেই মদ্যপান করতাম এবং

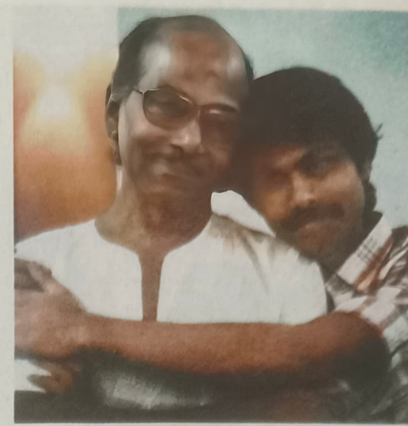


অন্তরা, সবিতা ও সলিল চৌধুরী

সিগারেট খেতাম। চরম বাড়াবাড়ি টাইপের ঝগড়ার পরে উনি বলে দিতেন, আমার মুখ দেখবেন না। সেবার তো 'গুরুচণ্ডালি' ভাষা নিয়ে ভীষণ তর্কাতর্কি হল। রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "অ্যাই শোন, সলিল চৌধুরী কে? তুই না আমি?" রেগে গিয়ে আমার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি শুয়ে পড়লাম আমার বসার ঘরে। আমাদের ঘর, পালঙ্ক আলাদা হয়ে যেত এমন অনেক রাতে। কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম ভাঙল ওঁরই ডাকে। দেখলাম, বিয়ারের বোতল দিয়ে লুচি বেলে, ভেজে, আলু পেঁয়াজের চচ্চড়ি রান্না করেছেন। তারপর ডাকছেন, "সুমন ওঠ। ভোর হল, খাবি না?"

কমরেডদের সমালোচক সলিল

আমেরিকায় এলে সলিলদা ওঁর ছেলের চেয়ে, আমার কাছে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। কারণটা খুব পরিষ্কার। বেনিয়ম করতে পারবেন বলে। ওঁর ছেলে খুব রেগে যেত বটে, কিন্তু লোকটা যে কোনওদিনই নিয়ম মানলেন না। চললেন নিজের নিয়ম মতে। যে কমিউনিস্ট পার্টিকে আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধেও গান লিখলেন, যখন মতানৈক্য হল। কোন গান জানেন? 'পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি'। চমকে গেলেন? প্রথমবার কথাটা শুনে আমিও চমকে গিয়েছিলাম। তারপর সলিলদা গানটা আমাকে গাইতে বলেছিলেন গলা ছেড়ে। এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কেন সেটা সমালোচনামূলক, বললেন, "সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি...' কী বলতেন কমরেডরা? 'সিধে পথে থাকো।' কিন্তু সেই ধাঁধায় বাকিদের জড়িয়ে নিজেরা কি থাকতেন সিধে হয়ে?' বা 'নিষেধের পাহারাতে ছিলেম রেখে ঢেকে'... এই বারণও তো কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেরই দেওয়া। এটা করবে না। ওটা করবে না। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া, নজরুল বুর্জোয়া... একমাত্র উদার কি কমরেডরাই?" অথচ কী আশ্চর্য, সমালোচনা তিনি দলের মধ্যে থেকেই করেছেন। কখনও বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেননি।

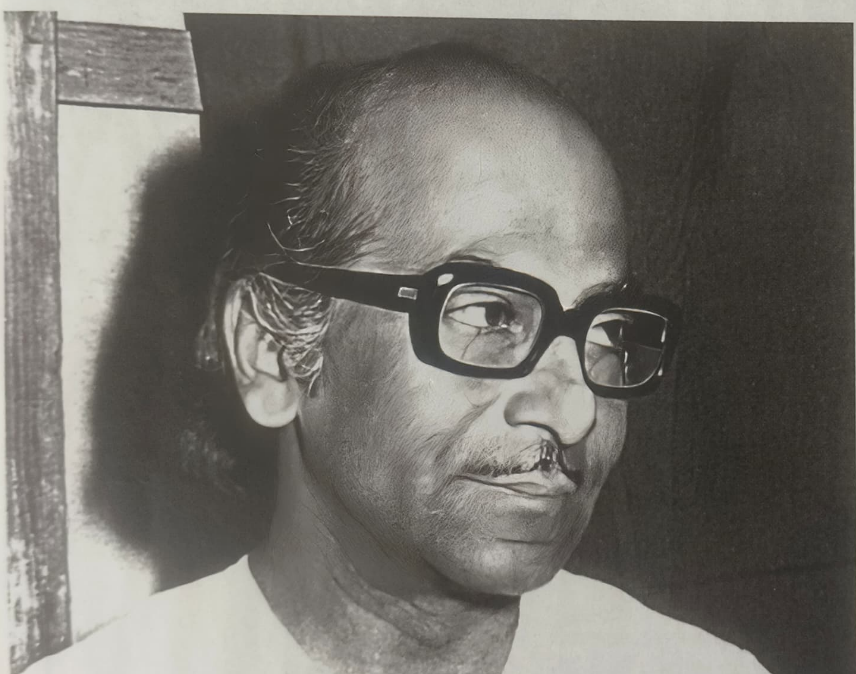


ছেলে সঞ্জয়ের সঙ্গে

আসলে সলিল চৌধুরী এমন এক মানুষ, যিনি সত্যি-সত্যি দ্বন্দ্বের অর্থ বুঝতেন। বুঝতেন, মানুষকে আপন করে নিতে। হয়তো সবসময় রাস্তায় নামেননি। কিন্তু উনি ওঁর ভাষা নিয়ে স্বপ্নকে ধরছেন। গানে এনেছেন সংগ্রামী চেতনা। অথচ মেহনতি মানুষের সেই গানে রাগ 'খামাজ', 'হংসধ্বনি' সব রাগ নিয়ে এসেছেন। আমাকে বারবার বলতেন, "বুঝলি সুমন, হিমাংশু দত্ত হলেন ফাদার অফ মডার্ন বেঙ্গলি মিউজ়িক।" আমি বলতাম, 'রবীন্দ্রনাথ'। তখন বলতেন, "তুই এখনও অনেক ছোট আছিস। বয়সটা ৬০ বছর পেরো, তারপর বুঝতে পারবি।"
এখনও রবীন্দ্রনাথ আমার মনে, স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কিন্তু বুঝি, সলিলদার ব্যাপারটা। প্রশ্ন জাগতে পারে, সলিল চৌধুরী যে বিশ্বাস থেকে গানগুলো তৈরি করেছেন, তা থেকে কোনও অভিমুখে পৌঁছতে পেরেছেন কি? হয়তো পারেননি। কিন্তু তার তো কোনও দরকারও ছিল না। কারণ যাত্রাপথটা জরুরি।

'এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও,
আমি নেমে যাব।
আমার টিকিট কাটা অনেক দূরে
এ গাড়ি যাবে না
আমি অন্য গাড়ি নেব...'

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলে ফেলার, অন্য গাড়ি নেওয়ার সাহস সলিলই দেখাতে পেরেছেন। নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে ঘোষণা করতে পেরেছেন, তাঁর টিকিট কাটা অনেক দূরে। শুধু একটা জন্ম শতবর্ষে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যাবে না।



ছক ভাঙতে ভালবাসতেন সলিল চৌধুরী

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: সায়ক বসু



■ সলিলের কোলে ছোট্ট অলকা

আমার বেস্ট ফ্রেন্ড

বাবাকে খুব কাছে পেয়েছিলেন বছর পাঁচেক। পরবর্তীকালে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে গেলেও, মেয়ের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাননি। **সলিল চৌধুরী**কে নিয়ে স্মৃতিচারণা করলেন সলিল ও তাঁর প্রথম স্ত্রী জ্যাতি চৌধুরীর বড় মেয়ে **অলকা নানজাপ্পা**

বাপির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর পাঁচজন বাবা-মেয়ের সম্পর্কের মতোই ছিল। খুবই অ্যাটাচড ছিলাম। বা বলতে পারেন, বাপিকে নিয়ে আমি অবসেসড ছিলাম। এতটাই ইমোশনাল কানেকশন ছিল যে, আমি আমার ছোটবোন তুলিকাকে প্রায়ই মজা করে বলতাম, আমি বাপির পেট থেকে হয়েছি আর ও মায়ের (সলিলের প্রথম স্ত্রী, চিত্রশিল্পী জ্যোতি ভট্টাচার্য) পেট থেকে! কিন্তু বাপিকে সবসময় কাছে পেয়েছি, শুধুমাত্র আমার শৈশবে। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন বাপি আর একটা বিয়ে করে (সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে) অন্য জায়গায় সংসার করতে চলে যান। এর জন্য আমি বাপিকে কখনও ক্ষমা করতে পারিনি বা



তাজমহলে বেড়াতে গিয়ে বাবা-মা ও বোনের সঙ্গে অলকা



একটি অনুষ্ঠানে সলিল ও জ্যোতির সঙ্গে তাঁদের তিন সন্তান অলকা, তুলিকা ও লিপিকা

বলতে পারেন বাপির এই সিদ্ধান্তকে কখনও মেনে নিতে পারিনি। যে-কোনও মেয়ের পক্ষেই তার বাবার দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নেওয়া কঠিন, বিশেষ করে যখন তার মা জীবিত। প্রথমদিকে কিন্তু সেই মহিলা আমাদের বাড়ি আসতেন, বাপির সঙ্গে রিহার্সাল করতেন। আমার মনে হয় গানের আকর্ষণেই বাপি ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বাপির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর প্রথমদিকে উনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন আমাদের বাপির থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার। আমি বাপির বাড়িতে ফোন করলে, উনি ফোন ধরে মিথ্যে বলতেন যে, বাপি বাড়ি নেই। এই কথাগুলো বললাম এটা বোঝানোর জন্য যে, একদিকে যেরকম বাপির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারিনি, অন্যদিকে বাপির কিছু গুণ আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। হতে পারে বাপি আমার মাকে ছেড়ে অন্য মহিলার সঙ্গে সংসার বেঁধেছেন, তবে তাই বলে বাপি কিন্তু কখনও নিজের দায়িত্ব থেকে সরে আসেননি। আমাদের বোনদের সব খরচ বলুন কিংবা বিয়ে দেওয়া বলুন কিংবা নিয়মিত খোঁজখবর রাখা বলুন, সব করেছেন। ইন ফ্যাক্ট, আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন বাপির আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। বাপি বিকেম মাই ভেরি গুড ফ্রেন্ড। আমার মা একটু অর্থোডক্স স্বভাবের হলেও বাপি বরাবর খুব লিবারাল ছিলেন। গরীব-বড়লোক, হিন্দু-মুসলমান, এগুলো নিয়ে বাপির কোনও ছুৎমার্গ ছিল না। আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয় সে একজন তামিল। কবিতা কৃষ্ণমূর্তির ভাই। বাপি কিন্তু এই বিয়েতে পূর্ণ মতামত দিয়েছিলেন। আর একটা কথা ক্লিয়ার করে দিতে চাই। অনেকেই বলেন, বাপির সঙ্গে আমার মায়ের নাকি মন্দিরে বিয়ে হয়েছিল এবং সেই বিয়ের কোনও বৈধতা নেই, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। বাপির আর মায়ের সোশ্যাল ম্যারেজ হয়, যেখানে আমার দাদু, মানে মায়ের বাবাও উপস্থিত ছিলেন। আর মাকে বাপি কখনও ডিভোর্সও দেননি।

বাপির প্রসঙ্গে বলতে গেলে কোনও পাতায় তা ধরানো যাবে না। এত স্মৃতি, এত গল্প। আমার যখন যেরকম মনে পড়ছে সেভাবেই গল্পগুলো বলছি। একবার মনে আছে, আমাকে স্কুলের কেজি ক্লাসে ভর্তি করানোর সময় আমি খুব কান্নাকাটি করছিলাম, কিছুতেই স্কুলে যেতে চাইছিলাম না। বাপি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, 'স্কুলে যেতে হবে না। তুই বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করবি।' আমার প্রতি বাপির এতটাই সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব ছিল। একটা সময় অবধি বাপি আমাকে স্কুলে

দিয়ে আসতেন, আবার নিয়েও আসতেন। আমি ছুটির সময় স্কুলের জানলার ধারে বসে বাপির অপেক্ষা করতাম। মাঝে মধ্যে আবার বাপি আমাকে মোহন স্টুডিয়োতে ওঁর মিউজ়িক রুমে নিয়ে যেতেন। প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলায় আমি স্টুডিয়োতেই থাকতাম। বাপি কাজ করতেন আর ওখানে বিমল রায় প্রোডাকশনের বাকিরা আমাকে খুব খাতির করতেন! আমার উপর নানাধরনের কস্টিউম ট্রাই করতেন। বাপি কোনও নতুন কবিতা বা গল্প লিখলে আমাকে ডেকে শোনাতেন। আমি সেই বয়সে কতটা বুঝতাম জানি না, কিন্তু মন দিয়ে বাপির কথা শুনতাম। পরবর্তীকালে বাপি অন্য বাড়িতে চলে গেলেও, আমার ও বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। দ্বিতীয় বিয়ের পরেও বাপি যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, একদম স্বাভাবিক থাকতেন। মা-ও কিন্তু কখনও আমাদের বলেননি, বাপির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে। কখনও-কখনও বাপি আমাকে ওঁর ওই বাড়িতেও নিয়ে যেতেন, যদিও আমার ওখানে ভাল লাগত না। আমার আটবছর বয়সের জন্মদিন বাপি খুব ধুমধাম করে পালন করেছিলেন। বিমল রায়, তালাত মেহমুদ, শৈলেন্দ্র সিংহ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে...সকলেই প্রায় পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। একটি বিশেষ কেকের দোকান থেকে শু-হাউজ় থিমের কেক তৈরি করিয়েছিলেন বাপি।



■ সলিল-জ্যোতি, সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়ে

বাপির কাজের প্রসেসটাও আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। কোনও নতুন গান তৈরির সময় বাপি ভোরবেলা উঠে পড়তেন। বাড়ির বাইরে পায়চারি করতে-করতে গানটা নিজের মধ্যেই গুনগুন করতেন। তারপর রুমে এসে হারমোনিয়াম বা পিয়ানোতে গানটা কমপ্লিট করতেন। বুঝতাম, ওই যে বাইরে পায়চারি করছেন, তখনই বাপি গানটা বেঁধে নিতেন। পুরো গানটা তৈরি হওয়ার পর বাপি ওঁর সহকারী কানু ঘোষকে ডেকে পাঠাতেন। সঙ্গে তবলাতে সঙ্গত করার জন্য কেউ আসতেন। তারপর বাকি মিউজ়িশিয়ানরা আসতেন। বাপির গানগুলো লেখা থাকত বাংলায়। যদি সেটা হিন্দি কোনও ছবির জন্য ব্যবহৃত হত, তাহলে বাপি শৈলেন্দ্র আঙ্কল (সিংহ), যোগেশজি বা গুলজ়ারসাহেবকে ডেকে পাঠাতেন। এরপর তৈরি হত গানের নোটেশন। গানে যদি কোনও কোরাস পার্ট থাকত, তাহলে সেই শিল্পীরা আসতেন। এসবের পর আসতেন প্রধান গায়ক-গায়িকা আর তারপর হত ফাইনাল রেকর্ডিং। এই ছিল বাপির পুরো কাজের প্রসেস। আমার চোখের সামনে সব হত। অনেকেই বলেন, এই সব কাজের সময় বাচ্চারা থাকলে সমস্যা হয়। বাপি কিন্তু বরাবর আমাকে রেকর্ডিংয়ে স্টুডিয়োর ভিতরে বসিয়ে রেখে কাজ করতেন।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। একবার কলকাতার বাড়িতে বাপি লতা মঙ্গেশকরের



■ সলিলের প্রথম স্ত্রী জ্যোতির সঙ্গে তাঁদের তিন কন্যা

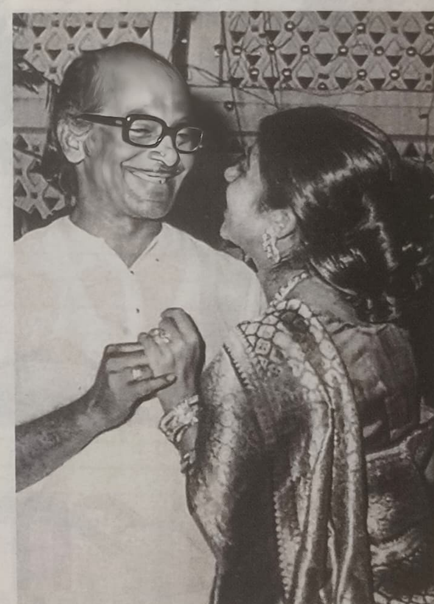


■ অলকার বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন সলিল চৌধুরী

আমার বাপি খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন। এরকমও হয়েছে যে লতাজি আমাদের বান্দ্রার বাড়িতে এসে মরাঠি স্টাইলে মাছ রান্না করে আমাদের খাইয়েছেন। দিলীপকুমারও বাপির...

'না যেও না' গানটির রিহার্সাল করছেন। সেই সময় অনেকেই জেনে গিয়েছেন যে বাপি কলকাতায়। বাপিকে দেখার জন্য বাড়ির বাইরে সকলে ভিড় জমিয়েছেন। তার মধ্যে বাপির যাঁরা খুব পরিচিত, তাঁরা বাড়ির ভিতর প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন। তাঁদের সামনেই বাপি কাজ করছেন। এবার মা-দিদারা তো ভিতরের লোকদের জন্য চা বানাবেন, কিন্তু এত ভিড় যে, কতজন আছেন সেটা গোনার জন্য ওঁরা বাড়ির দরজার বাইরে জুতো জোড়াগুলো গুণে সেই অনুযায়ী চা বানাতেন! লতাজি খুব ফুডি ছিলেন আর আমার বাপি খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন। এরকমও হয়েছে যে লতাজি আমাদের বান্দ্রার বাড়িতে এসে মরাঠি স্টাইলে মাছ রান্না করে আমাদের খাইয়েছেন। দিলীপকুমারও বাপির খুব ক্লোজ় ছিলেন। আমি যখন অনেকটা ছোট, তখন উনি একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বাপির মুখেই শোনা যে, বাড়িতে এসে উনি আমাকে কোলে নিতে চাইলে আমি ভয়ে বাপির কোলে চলে যাই, কিছুতেই দিলীপকুমারের কোলে উঠিনি!

ছোটবেলায় বাপি প্রায়ই আমাদের নিয়ে ঘুরতে যেতেন। বাপির ছিল গাড়ির নেশা। তাই আমাদের বাড়িতে অনেকধরনের বিদেশী গাড়ি ছিল। বাপি আমাদের গাড়ি করে বান্দ্রা থেকে লোনাভলা, খান্ডালা, পুনেতে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সেখানে গিয়ে আমরা হইহই করে পিকনিক করতাম। কখনও বা আবার মালাবার লেক, বিহার লেক, পাওয়াই লেকেও নিয়ে যেতেন। একবার মনে আছে, আরোমিল্ক কলোনিতে একটা পিকনিকে আমাদের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরও গিয়েছিলেন। রাস্তায় একটা করমচা ফল পড়েছিল, বাপি ওটা তুলে লতাজিকে দেন আর উনি ওটা নিজের মাথার চুলে লাগিয়ে নেন! বাপি আমাদের যখন লং ড্রাইভে নিয়ে যেতেন, তখন প্রায়ই একটা গল্প বলতেন। রবার্ট স্টিভনসনের একটা ছবি ছিল 'দ্য অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর'। সেই ছবির গল্পে নায়ক একধরনের আঠা আবিষ্কার করেছিল যেটা কোথাও লাগালে সেই জিনিসটা অনেক উঁচুতে লাফাতে পারত। বাপি মজা করে বলত, সেই আঠা আমাদের গাড়ির চাকায় লাগিয়ে নেবে আর আমাদের গাড়িটা জাম্প করবে! আমি আর বোন খুব ভয় পেয়ে যেতাম। একবার বাপিকে দিল্লি যেতে হয়েছিল বিমল রায়ের ডকুমেন্টরি 'গৌতম দ্য বুদ্ধার' একটা কাজে। বাপি আমাদেরকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। বাপির কাজের পর আমরা সকলে মথুরা, আগ্রা, তাজমহল সব জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাপি যেহেতু ফুডি ছিলেন, তাই নিজের হাতে বাজার করতেন। আর আমি হতাম বাপির সঙ্গী। বান্দ্রার খার মার্কেটে বাপির সঙ্গে বাজারের ব্যাগ হাতে যেতাম। ওখানে সবজিওয়ালা, মাছওয়ালা, সকলের সঙ্গে বাপির দারুণ সম্পর্ক ছিল। বাজার থেকে বাপি বড় মাছ, মটন, চিকেন, হাঁসের ডিম সব নিয়ে যেতেন আর মা রেগে যেতেন এত পরিমাণ বাজার দেখে! বলতেন, 'তুমি কি পুরো বাজারটাই তুলে নিয়ে এসেছ?' বাপির এই বাজার করার অভ্যাস থেকেই গিয়েছিল। আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমরা কলকাতায় উড স্ট্রিটে কিছুদিন ছিলাম। বাপি প্রায়ই সকালে পার্কসার্কাস মার্কেট থেকে ব্যাগভর্তি বাজার করে আমার বাড়িতে নিয়ে আসতেন। ইন ফ্যাক্ট, আমার প্রতি বাবা এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, আমার বিয়ের সময় বাবা কিন্তু আমার হাত আমার বরের হাতে



■ বড় মেয়ে অলকার সঙ্গে সলিল

তুলে দিতে পারেননি। ওই দায়িত্বটা আমার কাকা সমীর চৌধুরী পালন করেছিলেন।

একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। বাপি খুব ভাল ভূতের গল্প বলতেন। আমার ছোটবেলায় প্রতি সপ্তাহে কিছুদিন, ডিনারের পর বাপি ঘরের দরজা বন্ধ করে, লাইট অফ করে ভূতের গল্প বলা শুরু করতেন। আমার দুই বোন বাপির কোলে বসে থাকত কারণ ওরা সবচেয়ে বেশি ভয় পেত। আর আমরা বাদেও আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের অনেক বাচ্চারা আসত বাপির মুখে ভূতের গল্প শুনতে। বাপি আবার গল্পের শেষে একটা দারুণ টুইস্ট রাখতেন। এখনও খুব ইচ্ছে হয়, বাপি আসবেন আর বাপির মুখে ভূতের গল্প শুনব। জানি সেটা সম্ভব নয়, কিন্তু এই ইচ্ছেটা কিছুতেই মরে না।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



খুঁজে পাওয়া অরূপ রতন

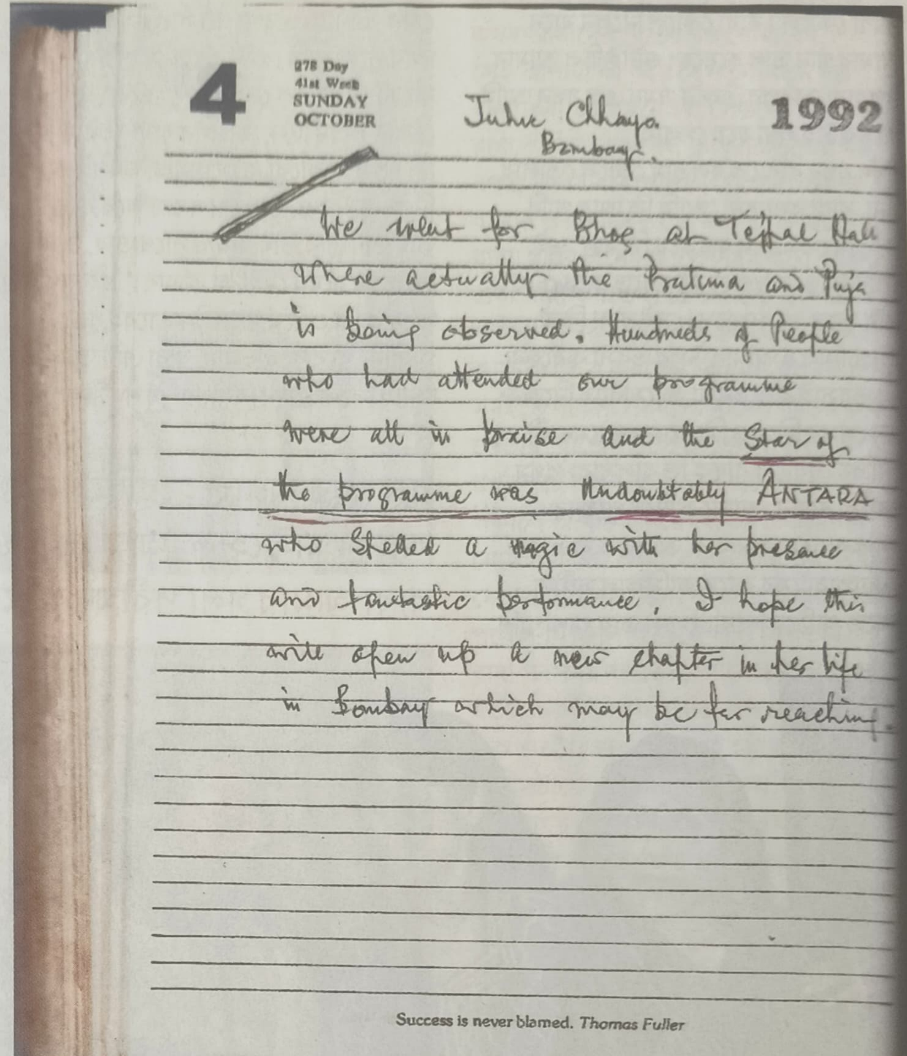
বাবার হারিয়ে যাওয়া ডায়েরির পাতা খুঁজে পেলেন কন্যা অন্তরা।
তাতে কী লেখা ছিল? আবেগপ্রবণ হয়ে কন্যা বললেন বাবার কথা।

সলিল চৌধুরীর স্মৃতিচারণে কন্যা অন্তরা চৌধুরী

বাবার জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে, ২০২৩ সালে আনন্দলোকের হয়ে একটি দীর্ঘ লেখা লিখেছিলাম। বাবাকে নিয়ে ওটাই ছিল আমার প্রথম এবং সবচেয়ে বড় লেখা। যা কিছু ছিল মনের মধ্যে, বলা এবং না-বলা, সব উজাড় করে দিয়েছিলাম পাঠকের কাছে। তাই আজ যখন আবার, বাবার জন্মশতবর্ষে নতুন করে লিখতে বসছি, তখন মনের মধ্যে আসছে একটাই প্রশ্ন। নতুন কী বলব, যা পাঠকের কাছে অভিনব মনে হবে? ঘটনা বা স্মৃতি তো আর পাল্টে যায় না। মানুষ চলে গেলে, নতুন করে কোনও স্মৃতি তৈরিও হয় না। কিন্তু যেটা জানা যায়, তা হল, সেই মানুষটার দৃষ্টিভঙ্গি। কী ভাবতেন মানুষটা আমাকে নিয়ে? বাবার জন্মশতবর্ষ বলে চারিদিকে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমিও এই ক'দিন খুব করে বাবার জিনিসপত্র ঘাঁটলাম। আর গুপ্তধনের সন্ধানের মতো করে পেলাম একটা অটোগ্রাফ। 'সা রে গা মা পা ধা নি সা'-কে অভিনবভাবে ক্যালিগ্র্যাফি করে। ওটা আমার জন্যই তৈরি করা। তাছাড়া পেলাম একটা ডায়েরি। দু'টি বছরের। একটা পাতায় লেখা আমাকে নিয়ে। 'রেকর্ডিং খুব ভাল হল। সবাই খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে আমার মানুর।' তাছাড়া আর একটি পাতায় লেখা, 'মানু না থাকলে আমি প্রোগ্রামিংটা করতেই পারতাম না। ও কীভাবে জানি সব শিখে গিয়েছে। আমি চাই ও এবার কম্পোজ়িংয়ে যাক।' একটা ডায়েরি আটের দশকের শেষের দিকের। আর একটি নয়ের দশকের শুরুর দিকের। দু'টিতেই মিশে আছি আমি। হঠাৎ করে খুঁজে পেয়ে এত কষ্ট হল...চোখে জল এল। মনে হল, ৩০ বছর কেটে গিয়েছে বাবাকে দেখিনি, গল্প করিনি, বাবার আদরের ছোঁয়া পাইনি। বাবার কথা বলতে গেলেই আমার প্রথম মনে পড়ে তাঁর

মিষ্টি হাসিটা। বাবা ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। আমার কখনও মনে পড়ে না যে, বাবা আমাকে জোর গলায় কিছু বলেছেন বা বকেছেন বলে। আসলে আমি তো খুব ছোট বয়স থেকেই বাড়ির বাইরে থাকতাম। মুম্বই থেকে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে পড়াশোনা করার জন্য। যাতে ভাল বাংলা শিখি। হস্টেলে থাকতাম। সেই কেজি থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত। ফলে সেই সময় বাবার সান্নিধ্য বেশি পেতাম না বলেই হয়তো বাবা শুধু আদরই দিয়ে গিয়েছেন।

আমার গলায় যে সুর আছে, সেটা তো বাবা জানতেন না। জানবেনই বা কী করে! মুম্বইতে তো থাকতাম না আমি। এমনকি একা একা এয়ার হস্টেসের হাত ধরে মুম্বই থেকে কলকাতা প্লেনে যাতায়াত করতাম। এখানে আমার এক পিসি আমাকে রিসিভ করতেন। বাবা-মা এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে, তাঁদের সময় হত না। যাই হোক, সেই পুতুল নিয়ে গুনগুন করে গান গাইতাম আমি। লতা মঙ্গেশকরকে প্রায়ই বাবার সঙ্গে গল্প করতে, গান গাইতে দেখতাম। ওঁর গলায় 'ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম' আমার খুব ভাল লাগত। পুতুল নিয়ে খেলার সময় ওই গানটাই গাইতাম। মা শুনেছিলেন বোধ হয়। তো বাবা তখন একটা সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখছিলেন 'মিনু' নামে। হিন্দি ছবি। সেই সিনেমার জন্য একটা বাচ্চা মেয়ের গলা খুঁজছিলেন। সেই সময় কী হত, লতা-আশারাই ছোট বাচ্চার গলায় গান


4 | 278 Day 41st Week SUNDAY OCTOBER | Juhu Chhaya Bombay. | 1992

We went for Bhog at Tejpal Hall where actually the Pratima and Puja is being observed. Hundreds of People who had attended our programme were all in praise and the Star of the programme was undoubtably ANTARA who spelled a magic with her presence and fantastic performance. I hope this will open up a new chapter in her life in Bombay which may be far reaching.

Success is never blamed. Thomas Fuller

সলিল চৌধুরীর ডায়েরির পাতা (সৌজন্য: অন্তরা চৌধুরী)



বাবা-মা-ই তাঁর গানের গুরু

গেয়ে দিতেন। কিন্তু বাবা সেটা চাননি। তখন মা-ই বলেন আমার কথা।

বাবা খুব অবাক হয়েছিলেন শুনে যে, আমার গলায় সুর আছে। যাই হোক, আমাকে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বাবা আমার গলা পরীক্ষা করলেন। এবং যখন জানলেন, মেয়ে গাইতে পারে... খুব খুশি হয়েছিলেন। আমার জন্য দু'টি গান বানিয়ে দিয়েছিলেন। একটি 'তেরি গলিয়োঁ মেঁ হম আয়ে' আর দ্বিতীয়টা, 'কালী রে কালী'। সেই প্রথম আমার রেকর্ডিং। বাবা আশাজির সঙ্গে একটা গানেও আমাকে গাইয়েছিলেন, 'ধীরে ধীরে হলে সে।' সেটা ছিল 'সিস্টার' ছবির 'বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু'র হিন্দি ভার্শন। মূল বাংলা গানটা আমি গেয়েছিলাম কোরাসে। তখন আরও ছোট। এবার গলা দেওয়ার সুযোগ পেলাম। মনে আছে, গানটা গাওয়ার পর বাবা এত খুশি হয়েছিলেন যে, আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তার পর থেকে প্রত্যেকটা গানের

রেকর্ডিংয়ের শেষে আমি বাবাকে বলতাম, 'বাবা কোলে'! বাবা কোলে নিলেন মানে আমার গান ভাল হয়েছে। ওটাই ছিল আমার উপহার! তারপর একটা সময় এল যখন আমি অনেকটাই লম্বা হয়ে গেলাম।
তখন যখন বাবাকে বলতাম কোলে তোলার জন্য, বাবা বলতেন, 'আমি কি আর পারি মা, তুমি তো এখন বড় হয়ে গিয়েছ!' এই সব ঘটনাগুলো এখন মনে পড়ে আর চোখ দুটো জলে ভরে আসে। সেই বাবা কিনা, প্রোগ্র্যামিংয়ে আমার উপর ভরসা করছেন! শুধু ভরসাই করছেন না, ডায়েরিতে নিজের মনে সেসব লিখেও গিয়েছেন! জানেন কী, জনপ্রিয় পিয়ানো বাদক ভি বালসারা প্রথম বাবাকে বলেন, আমাকে দিয়ে পুজোর গান করাতে! তখন বাবা আমাকে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্লাসিকাল সঙ্গীত শিখতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার পাশাপাশি আমি কন্নড় ভাষাতেও গেয়েছিলাম। যাই হোক, এখানে একটা গল্প বলি। বাবার লেখা আর সুরে আমি ছোটবেলায় যে ছড়ার গান করেছিলাম 'এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে', তার একটা লাইন ছিল, 'মা আর বাবা বলেছে ছি ছি ছি, ঝগড়া কোরো না মিছিমিছি, সব্বাই ভাল, নিজে ভাল হও, ভালবেসে জয় করে নাও/ তাই ভাব ভাব ভাব, সবার সাথে ভাব, ভাল ছেলেমেয়েদের নেইকো অভাব।' এই কথাটার মানে আমি প্রথমে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম, বাবা এটা আমার জন্যই লিখেছিলেন। আমার খুব শখ ছিল পুতুল হয়েছিল। কিন্তু বাবার কথা অমান্য করতাম না বলে পুতুলটা দিয়ে দিয়েছিলাম।
কিন্তু গানটা গেয়ে বুঝলাম, বাবা ওই পুতুল দিয়ে দেওয়ার ঘটনাটা নিজের গানের মধ্যে ধরেছে। আমাকে বলেছিলেন সবকিছুই ভাগ করতে হয়। সকলের সঙ্গে। উনি বলতেন, 'যত মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, তাদের দুঃখে-সুখে পাশে থাকবে, তারাও তোমাকে সেই ভালবাসা ফেরত দেবেন কোনও না কোনও ভাবে।'
অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সলিল চৌধুরী কীভাবে ওই অবিশ্বাস্য সুরগুলো রচনা

বাবা খুব অবাক হয়েছিলেন শুনে যে, আমার গলায় সুর আছে। যাই হোক, আমাকে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বাবা আমার গলা পরীক্ষা করলেন। এবং খুশি হলেন...



মা-বাবার সঙ্গে অন্তরা

পিয়ানো শিখতাম। বাবা মনে করতেন, শুধু গান গাইলে হবে না। বাদ্যযন্ত্র শেখাটাও খুব জরুরি। তাই চেয়েছিলেন, আমি যেন কম্পোজ়ার হই। হয়তো অন্য কেউ বললে, বাবা অত তাড়াতাড়ি আমাকে দিয়ে পুজোর গান গাওয়াতেন না। কিন্তু ভি বালসারা বলেছেন বলে বাবা আর 'না' করেননি।
আমার তখন সমস্ত রেকর্ডিং মুম্বই থেকে হত। সেই সময় বাবা আমার জন্য তৈরি করেন 'আয় রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে,' 'এক যে ছিল মাছি' বা 'বুলবুল পাখি'র মতো গানগুলো। 'বুলবুল পাখি' গানটা তো নিয়ে খেলার, খুব ভালবাসতাম খেলতে। একবার বাবা-মা বিদেশ থেকে ফেরার সময় একটা কথাবলা পুতুল নিয়ে এসেছিলেন আমার জন্য। আমি সেই পুতুলটি নিয়ে সারাদিন খেলতাম। একদিন একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে আসে আমাদের বাড়িতে। ওর বাবা-মা আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। তো হঠাৎ সেই বাচ্চাটি আমার পুতুলটি নেবে বলে এমন বায়না জুড়ল যে, বাবা আমাকে বললেন 'মানা, তুমি ওকে তোমার পুতুলটি দিয়ে দাও, আমি তোমাকে আবার ওইরকম একটা পুতুল এনে দেব।' সেদিন এত কষ্ট পেয়েছিলাম... খুব রাগ

করতেন! বাবার উপরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব যে ছিল, সে কথা তো সকলেই জানেন। তবে এত অনবদ্য সুরের চলন কী করে সৃষ্টি করতেন তিনি, সেটা আমি জানি না। উনিও খুব একটা জানতেন না। আমাকে বলেছিলেন, 'জানিস মানা, সুরগুলো ঠিক আমার কাছে চলে আসে। কীভাবে আসে জানি না।' অবশ্য শেষের দিকে বলতেন, 'এখন আর সুরগুলো আমার কাছে আসে না। পারি না আগের মতো...' যাই হোক, এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। যেটা বলছিলাম, সুর মাথায় না এলে বাবা বাজার করতে চলে যেতেন। একবার মনে আছে, 'না যেও না' গানটার সুর কিছুতেই মাথায় আসছিল না বলে, বাবা মা-কে নিয়ে পওয়াই লেকে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। মাকে বাবা 'ছুটি' বলে ডাকতেন।
বেড়ানোর ব্যাপারে মা-ই ছিল বাবার একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু পথে যেতে-যেতে হঠাৎ সুরটা মাথায় আসায়, মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে বাড়িতে চলে আসেন বাবা! বাড়ি ফিরে প্রথমে তবলায় রিদম সেট করে নিয়েছিলেন। তারপর তার উপর কর্ড এবং গানের কথা বসে। বাবা আমাকে হামেশাই বলতেন, 'সুর মাথায় আসার পর আমি তার উপর কথা বসাই।' এরকম ঘটনা একবার নয়, আমাদের বাড়িতে বহুবার ঘটেছে। বাড়িতে ফিরে বাবা বসে যেতেন পিয়ানোর সামনে। নতুন কোনও সুর তৈরি হলেই মা-কে বা আমাকে ডাক দিতেন। বলতেন, 'চটপট এই সুরটা তুলে নাও। নয়তো পরে আমি ভুলে যাব'। তখন



■ গানের অনুষ্ঠানে সপরিবার

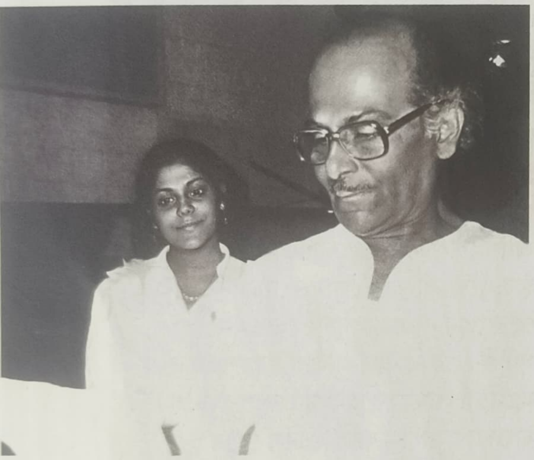


■ লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে সবিতা চৌধুরী ও সলিল চৌধুরী

তো আর রেকর্ড করে রাখার ব্যাপার ছিল না! আমি গাইতে থাকতাম আর তার উপর বাবা কথা লিখে চলতেন। আমার গাওয়া একটি গান 'এই সারাটা দেশ জুড়েই আমার ঘরবাড়ি' এভাবেই তৈরি হয়েছিল। আমার ছোড়দা সঞ্জয় চৌধুরীও ভাল সুরকার। বাবা একদিন ওকে ডেকে বললেন, 'পিপি, তুই কী নতুন সুর বানিয়েছিস শোনা দেখি?' দাদা শোনাল। বাবার খুব ভাল লাগল। বললেন, 'দাঁড়া তোর জন্য এর উপর আমি এখনই গরম গরম কথা লিখে দিচ্ছি।' আমাকে বললেন, 'তুই সুরটা গাইতে থাক।' আমি গাইলাম আর দেখি কথা লিখে ফেললেন 'চল মাঝি বৈঠা ধর ওপার যাই'। গানের সুরের সঙ্গে কথা এমনভাবে মিশে গেল যে, মনে হল যেন ওই গানটার সুর বাবারই তৈরি করা! এইরকমই ছিল সলিল চৌধুরীর প্রতিভা। বাবা আগে সুর বানিয়ে নিতেন, তার উপর কথা বসার পর, তারপর ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে বসতেন। বাবার বক্তব্য ছিল, 'আগে যদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান বানাতে বসে পড়ি, তা হলে নোটসের মধ্যে সীমাবদ্ধতা চলে আসবে। আগে মনটা মুক্ত করে সুর বানিয়ে নিতে হবে।' তবে যখনই সুর আসত না মনে, বাবা আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নিজের মনে-মনে বানিয়ে দারুণ ভূতের গল্প বলতে পারতেন। আমি আর আমার বোন সঞ্চারী অপেক্ষা করে বসে থাকতাম। বাবা কখন আমাদের ভূতের গল্প শোনাবেন, সেই আশায়! কী করে যে নতুন-নতুন গল্প বানাতেন! আজ মনে হয়, সেগুলো লিখে রাখলে অনেকে সলিল চৌধুরীর ভূতের গল্প বলার মুন্সিয়ানার আভাস পেতেন। অবশ্য বাজার ও রান্নাতেও তো দারুণ পটু ছিলেন বাবা! ছুটির দিনে সকালে নিয়ম করে বাজার এবং রান্না করতেন। ব্রেকফাস্টে 'হেলদি খাবার' খাওয়ার অভ্যেস ছিল। তাই কখনও কাস্টার্ড তৈরি করতেন। কখনও বা মিল্ক শেক। মুম্বইতে থাকার সময়, আমাদের বাড়ির কাছে পেডার রোডে হাঁটতে যেতেন বাবা। তারপর যখন পরে কলকাতায় চলে এলেন, তখন সকালে আমাকে নিয়ে যেতেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। সেখানে উনি হাঁটতেন, নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করতেন। তারপর আমরা ফেরার পথে গরম জিলিপি কিনে বাড়ি ফিরতাম। বাবা সবসময় বলতেন, 'গানে ভাল সুর করা যতটা জরুরি, ভাল খাওয়া-দাওয়া করাও ঠিক ততটাই জরুরি।' তাই হয়তো খাবার জিনিসটাকে এত গুরুত্ব দিতেন তিনি। বাবা কষা মাংস রান্না করবেন শুনলে বাড়িতে হইচই পড়ে যেত। অত ভাল কষা মাংস আমি বাবার হাত ছাড়া আর কোথাও খাইনি। অবশ্য তার আগে চলত বাজারপর্ব। সেটাও হাত খুলে। বাজারে কোনও দোকানদারকে ফেরাতেন না বাবা। গাদাগুচ্ছের মাছ, মাংস, সবজি...সব কিনতেন। বাবার বাজার যাওয়া মানেই ছিল মায়ের অবধারিতভাবে রেগে যাওয়া। কারণ মা বাসি জিনিস খেতে খুব একটা পছন্দ করতেন না, আর বাবা বাজার থেকে এত জিনিস কিনে আনতেন যে, ঘরে রাখার জায়গা থাকত না! মাংস রান্নার ব্যাপারটাও তো সেরকমই। বাবার হাতে রান্না মাংস খেতে ভাল হত ঠিকই, কিন্তু রান্নাঘর ভীষণ অগোছালো হয়ে যেত। মা খুব রেগে

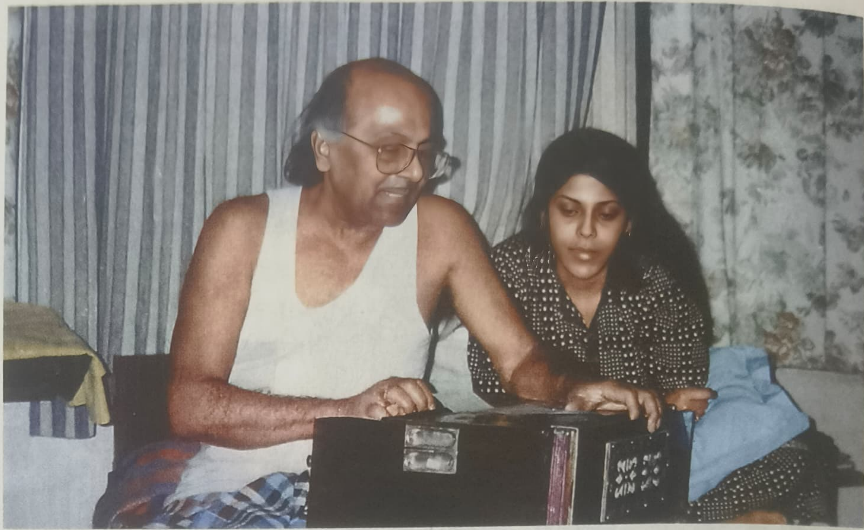
বাবার উপরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব যে ছিল, সে কথা তো সকলেই জানেন। এত অনবদ্য সুরের চলন কী করে সৃষ্টি করতেন তিনি, সেটা আমি জানি না।

যেতেন। কিন্তু এগুলোতেই আমাদের আনন্দ ছিল। এইভাবেই যে কত গান তৈরি হয়েছে... আসলে সলিল চৌধুরী মানুষটা ভীষণই বর্ণময় ছিলেন। পরিবার, আত্মীয়দের নিয়ে হইহুল্লোড় করে থাকতে ভালবাসতেন। এবং একবার আড্ডা শুরু হলে আর দেখতে হত না! এমন যে কতবার দেখেছি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলেদের সঙ্গে আড্ডা বসেছে এবং রাত কাবার হয়ে গেলেও সেই আড্ডায় কোনও বিরতি থাকত না। আমাদের বাড়ির দরজার বাইরে চটি গুনে চা তৈরি করা হত। তবে বাবার যে গুণটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছে, তা হল তাঁর ক্ষমাপ্রবণতা। সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারতেন। কিন্তু সেই মানুষটাই কি না শেষ দশ বছর একেবারে একা হয়ে গেলেন! যিনি সব ছাত্রছাত্রী, সহকারীদের নিয়ে গান তৈরি করতেন, তাঁকে কেউ বুঝল না। আসলে মুম্বইতে আটের দশকে যে গানের বদলটা



বাবার সঙ্গে

এল, মানে ওই ডিস্কো সং এবং অন্যান্য, বাবার সেগুলো ভাল লাগত না। তাছাড়া নিজের শহরে কিছু করার তাগিদ বহুদিন থেকেই বাবার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। যদিও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সলিল, তুমি শিল্পী। বিজনেসম্যান তো নও। যা করার এখানে থেকে করো।' বিজনেসম্যান বলার কারণ, বাবা এখানে এসে একটা 'বিশ্বমান-এর স্টুডিয়ো' বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেমন্ত জেঠু ঠিকই বলেছিলেন। বাবা বিরাট ধাক্কা খান সেই স্টুডিয়ো বানিয়ে। বেহালার কাছে একটা জায়গা ভাড়া নেওয়া হয়, সেখানে বানানো হয় 'সাউন্ড অন সাউন্ড' নামের স্টুডিয়োটি। কিন্তু মুশকিল হল, জায়গাটা কেনার সময় বাবাকে বলা হয়নি, ওটার উপরে একটা ওষুধের



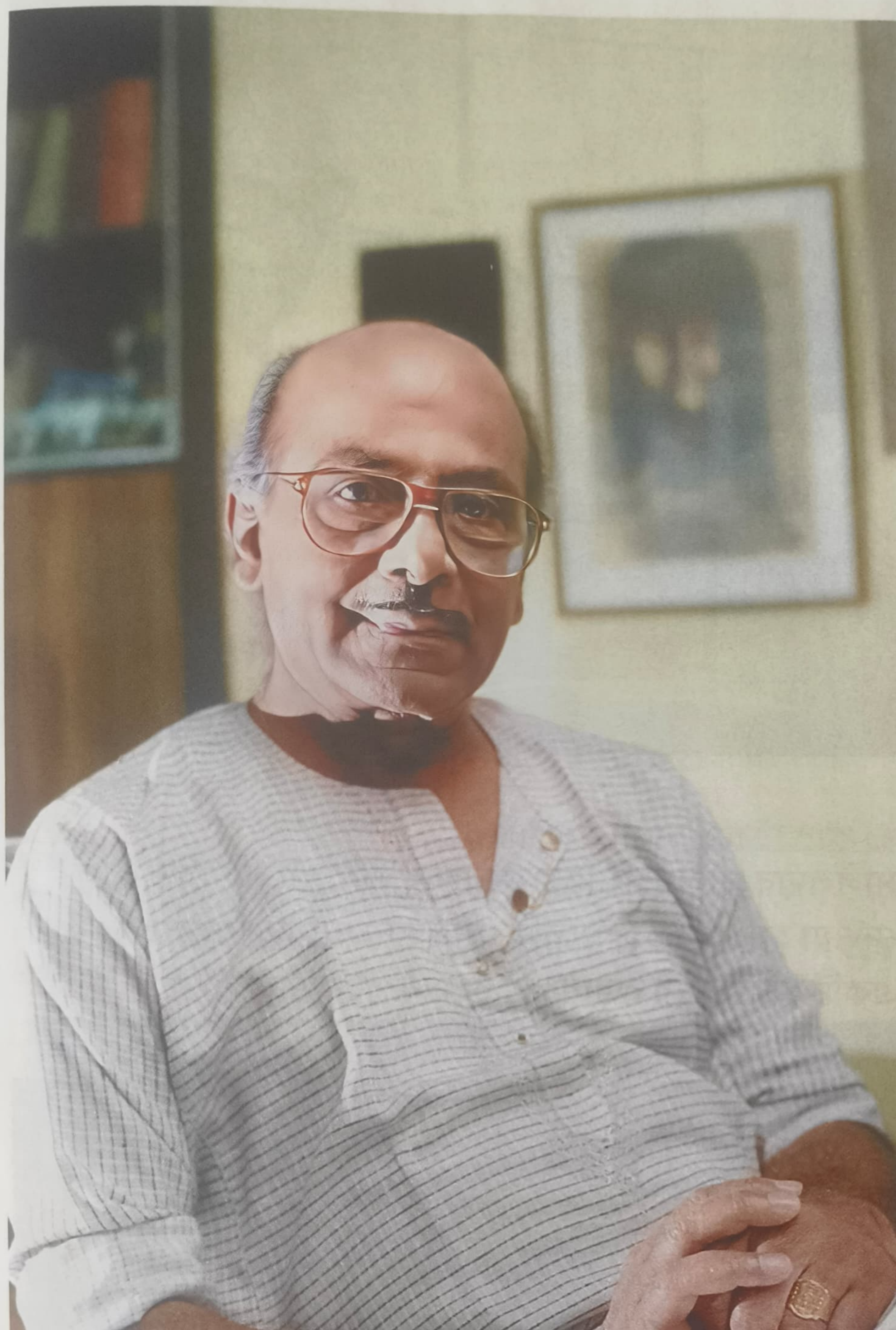
বাবার সঙ্গে বসে চলছে নতুন সুরে কথা বসানোর পর্ব

বেহালায় বানানো হয় 'সাউন্ড অন সাউন্ড' নামের স্টুডিয়োটি। কিন্তু জায়গাটা কেনার সময় বাবাকে বলা হয়নি, ওটার উপরে একটা ওষুধের ফ্যাক্টরি আছে। আমার আত্মভোলা বাবাও খুব একটা যাচাই করে নেননি। ফলে...

ফ্যাক্টরি আছে। আমার আত্মভোলা বাবাও খুব একটা যাচাই করে নেননি। ফলে গান রেকর্ডের সময় উপর থেকে ঠক ঠক করে শব্দ আসত। ফলে যখন টেক নেওয়া হত, তখন উপরে গিয়ে বলতে হত চুপ করতে। নয়তো কাজ করা যেত না। কিন্তু ওইভাবে তো আর বেশিদিন চলে না। বাবার সাধের স্টুডিয়োও চলল না। আমার বাবা, যিনি সারাজীবন মানুষকে বিশ্বাস করে এসেছেন, তিনি ঠকে গেলেন। একে কাজ কমিয়ে দেওয়া, তার উপর আর্থিক ক্ষতি বাবা মেনে নিতে পারলেন না। সলিল চৌধুরীকে কেউ বুঝলই না। বাবা আর আমি যখন বসে থাকতাম অবসরে, গান শুনতাম, তখন দুঃখ করে বলতেন, 'এখন আমাকে কেউ পাত্তা দিল না তো মানা! দেখিস, পরে দেবে। আমি চলে যাওয়ার পর আমার গান নিয়ে রিসার্চ হবে!' আসলে আমাদের ভারতবর্ষের যা রীতি (জীবিত থাকাকালীন কেউ মর্ম বোঝে না), সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন বাবা। তাই শেষ দশ বছর একা থেকে গেলেন। কেউ দেখা করতে আসেনি। কষ্ট পেয়েছিলেন ভীষণ। খানিক ডিপ্রেশনে... স্ট্রোকটা (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সালে) বোধ হয় সেই কারণেই হল।

বাবার কথা বললেই, চোখে জল এসে যায়। আর একটাই ছবি চোখের সামনে ভাসে। বাবার হাত পিয়ানোর রিডে। চোখ বন্ধ করে তিনি বাজিয়ে চলেছেন। এদিকে মা, সঞ্চারী আর আমি একসঙ্গে হারমনি করে গাইছি 'সুরের এই ঝরনা...'! বাবা সব সময় বলতেন, একজন শিল্পী তাঁর নিজের নিয়মে চলেন। নিজস্বতা নিয়ে। কোনও নিয়ম তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। তাই নিজের বামপন্থী আদর্শে ভর করে সারা জীবন লক্ষ্যে অবিচল থেকে গিয়েছেন তিনি। দেশের শাসকদের কাছ থেকে কোনওদিন কোনও সম্মান পাননি। বহু বাধা এসেছে। কিন্তু থোড়াই কেয়ার করে এগিয়ে গিয়েছেন সামনের দিকে। তাই যখন শেষ জীবনে একা হলেন, তখন নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন। কাছের মানুষদের বিশ্বাসভঙ্গ পীড়া দিয়েছে তাঁকে। একমাত্র মৃণাল সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ছাড়া তো কেউ শেষ সময়ে দেখা করতেও আসেননি। বাবা যখন বাড়িতে ছিলেন, আমি দেখতাম, পেনটা খাতার উপর ধরে বসে থাকতেন। লিখতেন না কিছু। মনে হয়তো আঁকিবুকি কাটত হাজার সুর। সেই লেখাগুলোই হয়তো এখন দেখতে পাচ্ছি আমি। নিজের 'মানু'কে ভালবেসে লিখে যাওয়া হাজার কথা ও চিঠি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে খুব। কিন্তু গর্বও হচ্ছে। কারণ এই মানুষটা আমার বাবা।

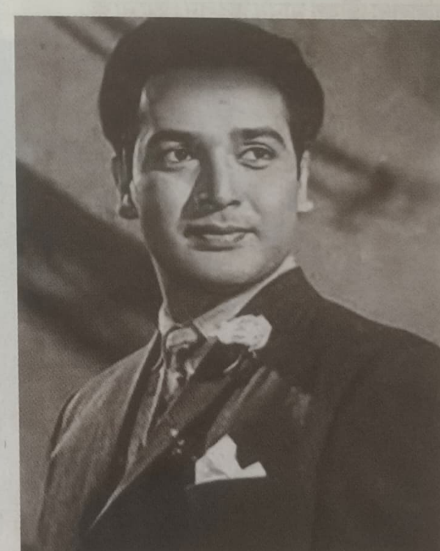
সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: সায়ক বসু



আমার অতিথি

মুম্বইতে একটা সময় তাঁর বাড়িতে নিয়মিত পার্টি হত, আর সেই পার্টির রেগুলার গেস্ট ছিলেন **সলিল চৌধুরী**। সলিলের সুরে একাধিক গানও গেয়েছেন নায়ক। প্রিয় সুরকারকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করলেন মুম্বইয়ের প্রথম বাঙালি সুপারস্টার **বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়**

সলিলদা আমার পরিবারেরই একজন বলে আমি মনে করি। ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ বম্বেতে। ওঁকে বরাবর ধুতি-পঞ্জাবি আর চটিতেই দেখেছি। বাঙালিয়ানায় ভরপুর। প্রথম আলাপেই উনি আড্ডা জমিয়ে দিতেন। ওঁর বম্বে আসার গল্প শোনাতেন। আড্ডা দিতে, গল্প করতে খুব ভালবাসতেন। কলকাতায় বহু কাজ করার পর বিমল রায়ের প্রোডাকশনে কাজের সূত্রে সলিলদা বম্বেতে আসেন। ইন ফ্যাক্ট আমিও বিমলদার প্রোডাকশনে কাজ করেছি। ওখানে তখন যেন চাঁদের হাট বসত! সব বাঙালি স্টলওয়ার্টরা এসে জড়ো হতেন। ঋত্বিক ঘটক, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, মণি ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী...সবাই বিমলদার ক্যাম্পের লোক। সলিলদার বেশিরভাগ ছবিই কিন্তু বিমলদার প্রোডাকশনে। একবার বম্বের মোহর স্টুডিয়োতে একটি ছবির শুটিং করছিলাম, সেখানেই বিমলদার অফিস ছিল। ওই স্টুডিয়োতেই সলিলদার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। সলিলদা প্রথম আলাপেই আমাকে বলেন, 'তুমি গান-টান গাও? তোমার গলায় একটা এক্স ফ্যাক্টর আছে।' তখন আমি স্টার হয়ে গিয়েছি। তবুও সলিলদা বলেছেন, ফেলি কী করে! আমার কণ্ঠস্বর শুনে ওঁর মনে হয়েছিল আমি গান গাইতে পারি। সলিলদা নাকি এভাবেই গায়ক-গায়িকা স্পট করতেন। শুধু সেখানেই থেমে না থেকে, সলিলদা আমাকে দিয়ে একটি গান রেকর্ড করান। 'যায় যায় দিন' গানটি কিন্তু সুপারডুপার হিট হয়। আমি ভাবতেই পারিনি যে আমার গান



■ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

শ্রোতারা এত ভালবাসবেন! এই গানের আবার রিমেকও হয়েছে! আরও চার-পাঁচটা গান আমি সলিলদার সুরে গেয়েছি। মেহবুব স্টুডিয়ো, এইচএমভি স্টুডিয়োতে সেসব গানের রেকর্ডিং হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে হি ওয়াজ় আ জিনিয়াস, তবে এটা সকলেই জানেন। আমি বরং মানুষ হিসেবে সলিলদা



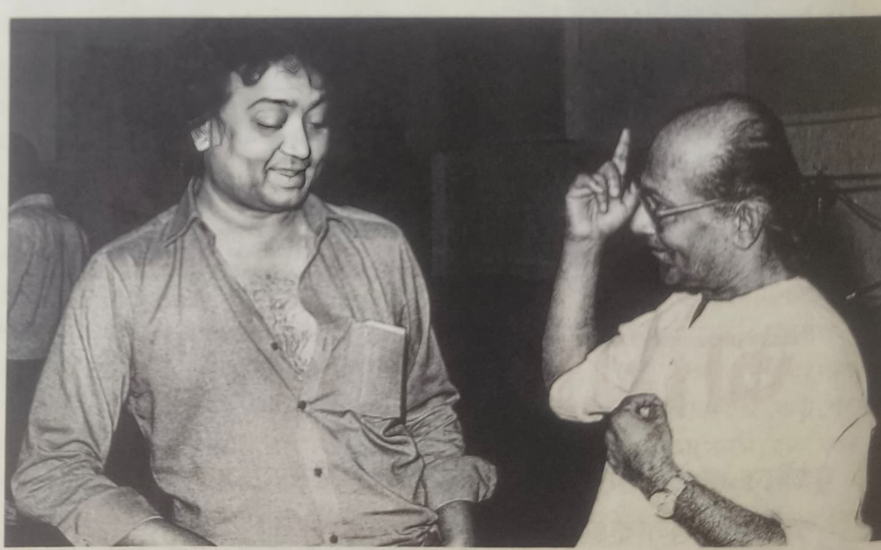
■ লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে সলিলের জুটি ছিল অনবদ্য

কেমন ছিলেন সেটা নিয়ে একটু কথা বলি।

সময়জ্ঞান ছিল না

সলিলদা ভীষণ মানুষ ছিলেন। অনেকে বলতেন খামখেয়ালি, তবে আমার মনে হত উনি আসলে সবসময় কাজ নিয়ে ডুবে থাকতেন। সবসময়ই সুর বাঁধছেন, গান নিয়ে ভাবছেন, গানের কথা লিখছেন। হি ওয়াজ় আ পারফেক্ট মিউজ়িশিয়ান। তবে সবসময় মিউজ়িক নিয়ে ভাবতেন বলে, ওঁর সময়জ্ঞান বলে কিছু ছিল না। আর এটাই কিন্তু সলিলদার ক্ষেত্রে একটা নেগেটিভ পয়েন্ট ছিল। বম্বেতে খুব প্রফেশনালি কাজ হয়। সলিলদা যদিও খুব বড় মাপের শিল্পী ছিলেন, তবুও ওঁর পাংচুয়ালিটির অভাবের জন্য ওঁকে ধীরে-ধীরে সাইড করে দেওয়া হয়। এরকম অনেক ক্ষেত্রে শুনেছি, সলিলদা দায়িত্ব নিয়েছেন একটি ছবিতে সুর করার। কিন্তু মাঝপথে একটা বা দুটো গান করে উনি হাওয়া! আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন প্রযোজকের কী অবস্থা ভাবুন। বম্বেতে কমিটমেন্ট ফেল করলে আপনার বেশিদিন কাজ করা মুশকিল। বা এরকমও শুনেছি, স্টুডিয়ো বুক করে গান রেকর্ডিং হচ্ছে। উনি হঠাৎ উধাও। পুরো কাজ বন্ধ হয়ে থাকল শুধুমাত্র ওঁর জন্য! এটা কিন্তু শুধু কাজের ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তিগত পরিসরেও হত। ধরুন আমি, হেমন্তদা (মুখোপাধ্যায়)

সলিলদার পাংচুয়ালিটির অভাবের জন্য ওঁকে সাইড করে দেওয়া হয়। এরকম শুনেছি, সলিলদা দায়িত্ব নিয়েছেন একটি ছবিতে সুর করার। কিন্তু মাঝপথে উনি হাওয়া!



■ ভূপিন্দর সিংহর সঙ্গে

আর সলিলদা আড্ডা দিচ্ছি। আমরা প্রায়ই বম্বের সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে বসে গান নিয়ে আড্ডা-আলোচনা করতাম। সলিলদা হুইস্কি ছাড়া কিছু পান করতেন না। মনে আছে, একবার ওঁকে বিয়ার অফার করেছিলাম, খুব রেগে গিয়েছিলেন। আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'বিয়ার আবার কেউ খায় নাকি!' যাই হোক, তো এরকম এক আড্ডায় হঠাৎ আমি আর হেমন্তদা আবিষ্কার করি, সলিলদা বেপাত্তা! গল্প করতে-করতেই হঠাৎ গায়েব

হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ওই হোটেলে একটা ফিক্সড রুম ছিল। সেখানে গিয়েও ওঁকে পাওয়া গেল না। ঠিক মিনিট কুড়ি বাদে সলিলদা রুমে ফিরে এলেন। বললেন, 'আরে চিন্তা করিস না, বাইরে গানের কথা লিখতে গিয়েছিলাম!' ওই যে বললাম উনি সবসময় গান নিয়েই বুঁদ থাকতেন। আমাদের সঙ্গে গল্প করতে-করতেই হঠাৎ হয়তো কোনও গানের কথা মাথায় এসেছিল, উনি তখুনি বাইরে বেরিয়ে একা-একা গানের সুর ও কথা বেঁধে ফেলতেন! এসে বলতেন, 'বিশু তোর গান রেডি!' এই ছিলেন সলিলদা। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং মেনেও নিয়েছিলাম যে, সলিলদা হঠাৎ করেই কোনও আসর থেকে উধাও হয়ে যেতে পারেন!

হেমন্তদা আর সলিলদার জুটি ছিল অনবদ্য। 'কোহরা' বলে একটা ছবির পরিকল্পনা করছিলেন দু'জন। সলিলদা গানের একটা রাফ স্কেচ শোনাতেই হেমন্তদা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সলিল তোমার এই গান সুপারহিট হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না!' এরকম বন্ধন ছিল দু'জনের, এটা আজকের দিনে ভাবা যায়? সবিতার সঙ্গেও আমি গান গেয়েছিলাম। সলিলদা আর সবিতার জুটিও খুব মিষ্টি ছিল। দু'জনের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্মান এবং ভালবাসার জায়গা ছিল। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম পিয়োর হাজবেন্ড-ওয়াইফ কেমিস্ট্রি খুব কমই দেখা যায়। তবে সলিলদার আগের স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না, শুধু অভিনেতা কেষ্ট মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলাম যে, সলিলদার আগে একটি বিয়ে হয়েছিল। সলিলদার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে কেষ্টদার আলাপ ছিল। আর সলিলদার মতো শান্ত স্বভাবের মানুষও সচারচর দেখা যায় না। খুব আস্তে কথা বলতেন এবং ওঁকে কখনও রেগে যেতে দেখিনি। কোনও গানের রেকর্ডিংয়ের সময়েও চিৎকার করতেন না, সবসময় মাথা ঠান্ডা। শুধু অন্য কিছু মাথায় এলে উনি বেপাত্তা হয়ে যেতেন, এই আর কী!

খাবারের সঙ্গে সুর... এক সূত্র

খাওয়ার ব্যাপারে উনি সবসময় মাছ প্রেফার করতেন। আমার বম্বের বাড়ি ছিল হোটেলের মতো। যেহেতু আমি একা মানুষ তাই আমার অনেক সহকর্মীই আমার বাড়িতে এসে পার্টি করতেন, মদ্যপান করতেন। আমার রান্নার লোককে বলা ছিল, সবসময় প্রস্তুত থাকবে। দিনের যে-কোনও সময় যে-কেউ এলে তার জন্য রান্না করতে হতে পারে! আমার বাড়ির সব পার্টিতে সলিলদা ছিলেন রেগুলার গেস্ট। ওঁকে ছাড়া কোনও পার্টি হত না। আমার পার্টির ইউএসপি ছিল ভাল খাবার, ভাল মদ আর ভাল গান। তো গানের দায়িত্বটা সলিলদা নিজে বুঝে নিতেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে সলিলদার কাছে সবসময় আবদার থাকত উনি যেন 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ' গানটি শোনান। সলিলদাকে আমি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম, এই সুর আপনি কোথা থেকে পান! উনি বলতেন, 'আমি কিছুই করি না। আমার মনে হয়, উপর থেকে কেউ এসে আমাকে সুরটা দিয়ে গেলেন!' বম্বের সব বাঘা-বাঘা মিউজ়িশিয়ানরা সলিলদাকে ভয় পেতেন এবং সমীহ করে চলতেন। সেই সময় সেবিস্টিয়ান নামক একজন খুব বড় অ্যারেঞ্জার ছিলেন। উনি আমাকে নিজে বলেছিলেন, 'বম্বের কোনও মিউজ়িশিয়ান যে নোট বাজাতে

সলিলদা গানের একটা রাফ স্কেচ শোনাতেই হেমন্তদা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সলিল তোমার এই গান সুপারহিট হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না!'



মঞ্চে গানের অনুষ্ঠানে সলিল



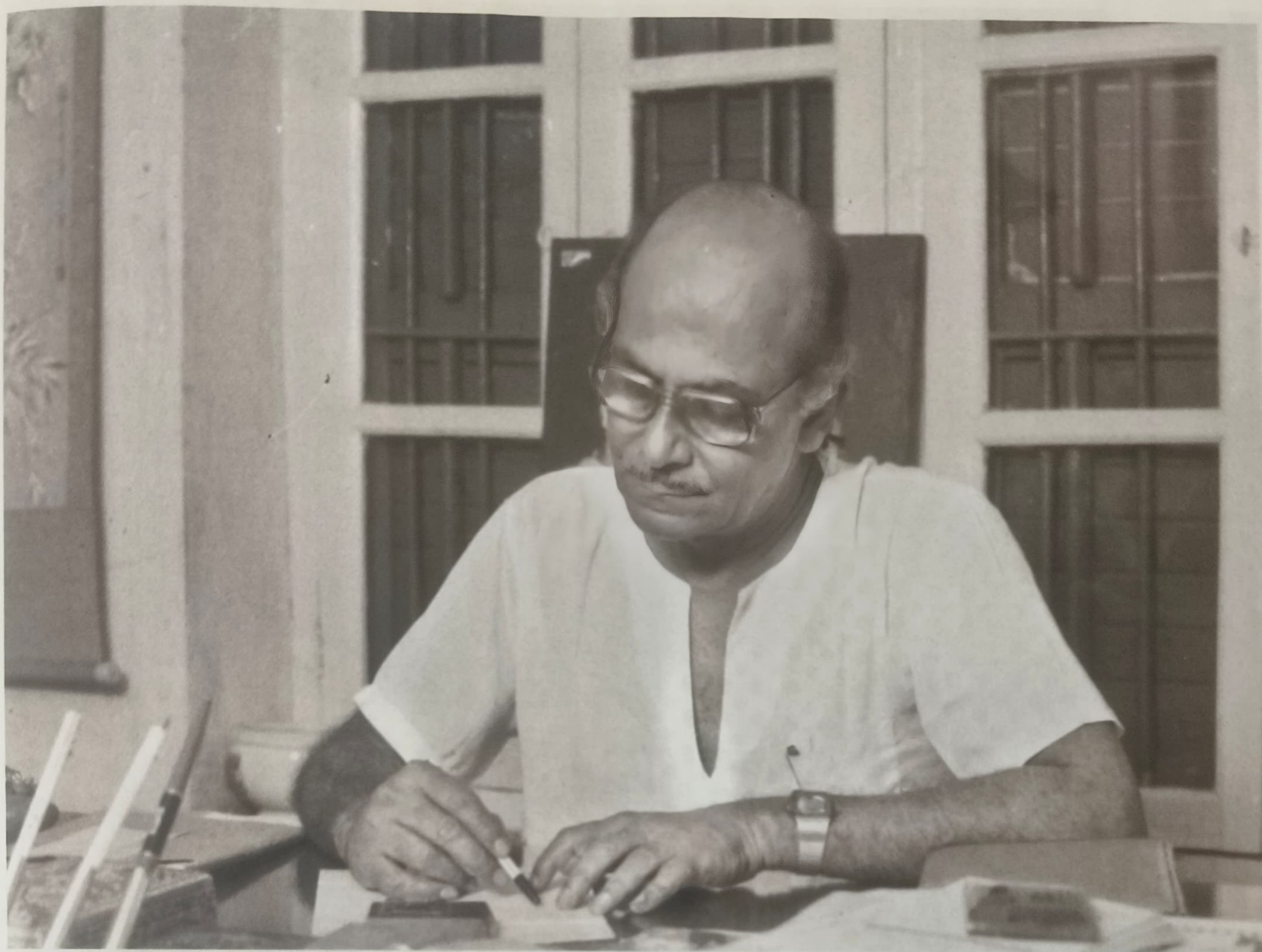
সুবীর সেন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরী

> বম্বেতে কাজ কমে গেলেও সলিলদার মধ্যে কোনও ডিপ্রেশন কখনও গ্রো করেনি। খুব পজ়িটিভ মানুষ ছিলেন। কিন্তু কাজ কমে যাওয়ার সঙ্গে ওঁর মদ্যপান করাটা বেড়ে যায়। সেই সময় বম্বেতে কোনও লবি না থাকলেও, এক-একটা বাধা ছিল।

পারতেন না, সলিলদা সেটা বাজিয়ে দেখিয়ে দিতেন। এরকম সুরকার বম্বেতে আগে কখনও আসেননি।' আমার সঙ্গে পঞ্চমেরও (আর ডি বর্মন) খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। একটা সময় সলিলদার হাতে কাজ একদম কমে যায়, বম্বেতে তখন অনেক নতুন সুরকার জায়গা করে নিচ্ছে। সেই সময় একদিন পঞ্চমের সঙ্গে আড্ডা হচ্ছিল, তখন ও বলেছিল, 'সলিলদা হল খাজ়ানা। ও যদি শুধু বসেও থাকে, তাহলেও যথেষ্ট। সলিলদা শুধু যদি আমাকে গাইড করে দেয়, তাহলেই চলবে।' তবে বম্বেতে কাজ কমে গেলেও সলিলদার মধ্যে কোনও ডিপ্রেশন কখনও গ্রো করেনি। খুব পজ়িটিভ মানুষ ছিলেন। কিন্তু হ্যাঁ, কাজ কমে যাওয়ার সঙ্গে ওঁর মদ্যপান করাটা অনেক বেড়ে যায়। সেই সময় বম্বেতে কোনও লবি না থাকলেও, এক-একটা ঘর বাঁধা ছিল। ধরুন, দিলীপকুমারের ছবিতে নৌশাদ, রাজ কপূর থাকলে ছবিতে সুর দেবেন শঙ্কর জয়কিষণ, দেব আনন্দ হলে এস ডি বা আর ডি বর্মন। সলিলদা সেরকম কারও ঘরের লোক হতে পারেননি, তবে সকলেই ওঁকে শিল্পী হিসেবে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। একবার লতা মঙ্গেশকর আমাকে বলেছিলেন, 'ইয়ে আদমি জিনিয়াস হ্যায়। কোথা থেকে যে সুর খুঁজে নিয়ে আসেন কেউ জানেন না। ক্ল্যাসিকাল হোক, ওয়েস্টার্ন হোক কিংবা ফোক, সব ধরনের মিউজ়িকেই উনি পারদর্শী!' লতাজির সঙ্গে সলিলদার দারুণ সম্পর্ক ছিল। বলতে গেলে, এই জুটির সব গানই সুপারহিট!

বম্বেতে থাকাকালীন সলিলদার সঙ্গে শেষ দেখা আমার বাড়ির পার্টিতেই। সেই সময় ঋত্বিক ঘটক আর কুমার শানুর বাবা পশুপতি ভট্টাচার্য আমার বাড়িতেই থাকতেন। ওঁদের সঙ্গে সলিলদার খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। মাঝেমধ্যে হৃষিদাও (মুখোপাধ্যায়) আসতেন। আর আমার কুক অমর সিংহের হাতে খাবার খেতে দারুণ পছন্দ করতেন সলিলদা। আগেই বলেছি উনি মাছ খেতে খুব পছন্দ করতেন। এছাড়া অমরের হাতে খাসির মাংসের কোর্মা আর চিকেন কাবাব ওঁর খুব প্রিয় ছিল। সলিলদার সঙ্গে মাঝেমধ্যে সঞ্জীবকুমার ও আড্ডা দিতে আসতেন। আর একজন আসতেন, যাঁর সঙ্গে সলিলদার দারুণ ভাব ছিল, তিনি হলেন বিলায়েত খাঁ সাহেব। সে সব যে কী দিন ছিল!

সলিলদা যেমন আসর থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যেতেন, ঠিক একইভাবে উনি বম্বে শহর থেকেও উধাও হয়ে গেলেন একদিন! বলতে দ্বিধা নেই, তখন আমিও কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে, ওঁর খোঁজ রাখা হয়নি। অনেকদিন পর কলকাতায় একটি কাজে যাই। ওখানে টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে হঠাৎ সলিলদার সঙ্গে দেখা। সেদিন সলিলদাকে দেখে খুব কষ্ট হয়েছিল। বম্বেতে যে মানুষটা রাজার মতো থাকতেন, কলকাতায় ওঁকে দেখে খুব ফিকে লেগেছিল। কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে বললেন যে, উনি ক্রাউড ফান্ডিংয়ে একটি ছবি তৈরি করছেন। আমার মনে হয়েছিল, বম্বেতে গিয়ে কাজের প্রতি কোথাও একটা সলিলদার সিরিয়াসনেস কমে গিয়েছিল। কাজের প্রতি ডেডিকেশন বা ফোকাসটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর বম্বের মতো প্রফেশনাল ইন্ডাস্ট্রিতে সেরকম হলে কাজ পাওয়া মুশকিল। সলিলদার মতো



নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে মিউজ়িকে ডুবে থাকতেন সলিল

আমার কুক অমর সিংহের হাতে খাবার খেতে দারুণ পছন্দ করতেন সলিলদা। অমরের হাতে খাসির মাংসের কোর্মা আর চিকেন কাবাব ওঁর খুব প্রিয় ছিল। এছাড়া মাছ খুব প্রিয় ছিল।

প্রতিভা এভাবে কাজ না পেয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন, এই ভাবনাটা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। ওঁর ছোটভাই বাবু চৌধুরী আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল। বাবু বলত, একটা সময় দাদা বাড়িতে কারও সঙ্গে ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলতেন না, সারাক্ষণ নিজের রুমের দরজা বন্ধ করে গান নিয়ে চর্চা করতেন। সেই মানুষটার গানের প্রতি ফোকাস সরে যাচ্ছে, এটা ভাবলে সত্যি অবাক লাগত। আমার জীবনে আমি কয়েকজন জিনিয়াস মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তার মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, কিশোরকুমার, সত্যজিৎ রায় আর সলিল চৌধুরী।



সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সলিল

বেশ অনেক বছর আগে কলকাতায় সল্টলেক স্টেডিয়ামে সলিল চৌধুরী নাইটে আমি এসেছিলাম। সোনু নিগম সহ অনেকে ছিলেন। সবিতাও ছিল সেখানে। ওর অনুরোধেই আমি 'যায় যায় দিন' গানটা গাই। সলিলদার সুরে গাওয়া আমার প্রথম গান। খুব মিস করি মানুষটাকে। এখনও যদি ঘরোয়া কোনও পার্টি হয়, মনে হয় এই বুঝি হারমোনিয়াম নিয়ে সলিলদা গান শোনাতে বসে পড়বেন!

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



আমার অভিভাবক

সলিল চৌধুরীকে ‘পিতা’ বলে মানেন তিনি। শুধু সঙ্গীত নয়, জীবনের উপরেও গভীর প্রভাব রেখেছেন সলিল। **দেবজ্যোতি মিশ্র**র আবেগময় শ্রদ্ধার্ঘ্য...

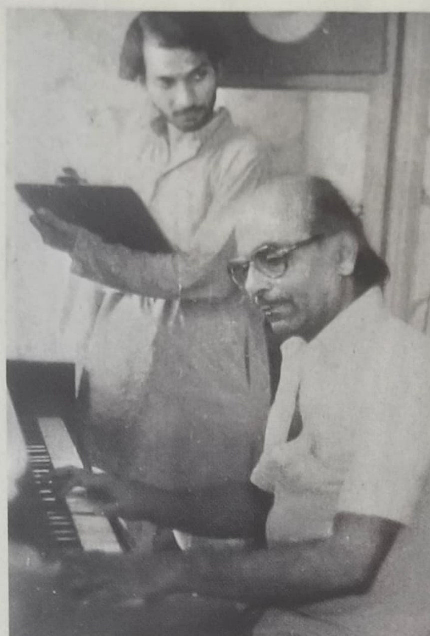
এই পৃথিবীতে সব ভাল হয়তো আপনা আপনি হয়ে যায়। মহাকাল যেন সাক্ষাৎ হ্যামলিন। তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। আমরা একে-একে এগোচ্ছি তাঁর দিকে। নদী যেমন এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। সলিল সাগরে আমিও মিশে গেছি কালের নদী হয়ে।

সলিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার ঘটনাটা হঠাৎ করেই ঘটেছিল। এমন দিন জীবনে একবারই আসে। আমি তখন ‘প্রতিধ্বনি’ নামে একটা কয়্যারের দলে বেহালা বাজাই। সবে টুয়েলভ পাস করেছি বা কলেজে ঢুকেছি। সন্ধ্যাগুলো সুরে কাটে। ঘরে ফিরেও নোটবই খুলি, নতুন কিছু বানানোর স্বপ্নে।

একদিন কয়্যারের অনুষ্ঠান দেখতে এলেন সলিল চৌধুরী। মঞ্চে আমি বেহালা বাজাচ্ছি, হঠাৎ দেখি তিনি উঠে এলেন সামনে। মনে হল, কেউ আমার পায়ে পেরেক মেরে দিয়েছে! শরীর নড়ছে না। শুধু আলো এসে পড়ছে তাঁর মুখে, আর আমার চোখে ঝলসে উঠছে বিস্ময়! সলিলদা তো সূর্য। তাঁকে সামনে দেখা মানে চোখ ঝলসে যাবেই।
বাজনা শেষ হলে তিনি বললেন, "তুমি ভালো বাজাও।" এইটুকু একটা কথা। কিন্তু শুনে মনে হল যেন আকাশবাণী! আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বলা যায়, জীবন নদী বাঁক নিল নতুন দিকে।
তারপর যেন সব নিজে থেকেই ঘটতে থাকল। তিনি বললেন, নতুন এক সঙ্গীতদল তৈরি করছেন, সেখানে আমাকে চান। আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কথাটা। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে এমন এক নিশ্চয়তা ছিল, যা প্রশ্নের অবকাশ রাখেনি।
সলিলদার স্ত্রী সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে প্রথমবার মঞ্চে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অভিজ্ঞতা ভুলতে পারব না কোনওদিন। উনি ছিলেন আমার 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'। ওঁর গলায় এমন এক উষ্ণতা, যেন গান নয়, এক জনপদের প্রাণ কথা বলছে। আমি তখন শুধু শুনছি, বাজাচ্ছি, আর মনে রাখছি। সলিল চৌধুরীর প্রতিটি সুরের ভেতরে একটা গল্প আছে, একটা সময়ের গন্ধ আছে। সেটা অনুভব করেছি।

সান্নিধ্য, সুর ও জীবন

সলিলদা গান সাজাতেন নিজের হাতে। প্রতিটি সুর, প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের জায়গা তিনি জানতেন নিখুঁতভাবে। আমি তখন একেবারে তাঁর



সলিলের পাশে ছাত্র দেবজ্যোতি

চেলা। তাঁর পাশে থেকে শেখার চেষ্টা করি, শুধু শুনে বুঝি... এই মানুষটার পাশে থাকা মানেই এক অন্য আলোয় থাকা। সলিলদার পাশে সুরেরা বসে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করি।
'ঘুম ভাঙার গান' তৈরি হচ্ছিল তখন। আমি ছিলাম সেখানে, ভায়োলিনে। গানটা যেন জন্ম নিচ্ছে চোখের সামনে। একবার, দু'বার, তিনবার রিহার্সাল হল। প্রতিবার নতুন লাগত শুনতে। মনে হত, এই গান শুধু ঘুম ভাঙার নয়, জেগে ওঠারও গান। এমনই কত কত গল্প। গল্প হলেও সত্যি। স্বপ্নদের সত্যি হয়ে ওঠার গল্প। স্টুডিয়োর ভিতরে গরম বাতাসে মিশে থাকত সুরের গন্ধ। কেউ ঘামছে, কেউ হাসছে, কেউ নোট কপি করছে। সকাল, বিকেল, রাত... সব এক হয়ে যেত। সেই দিনগুলোয় আমরা যেন কাজ করতাম না, বেঁচে থাকতাম।
একদিন সলিলদা বললেন, "চল, আজ তো কিছু করছিস না?"
আমি হেসে বলেছিলাম, "আপনার সঙ্গে থাকলে তো প্রতিদিনই ছুটি।"
ঘুরলাম গোটা শহর। সলিলদার চোখ দিয়ে



ঋত্বিক ঘটক

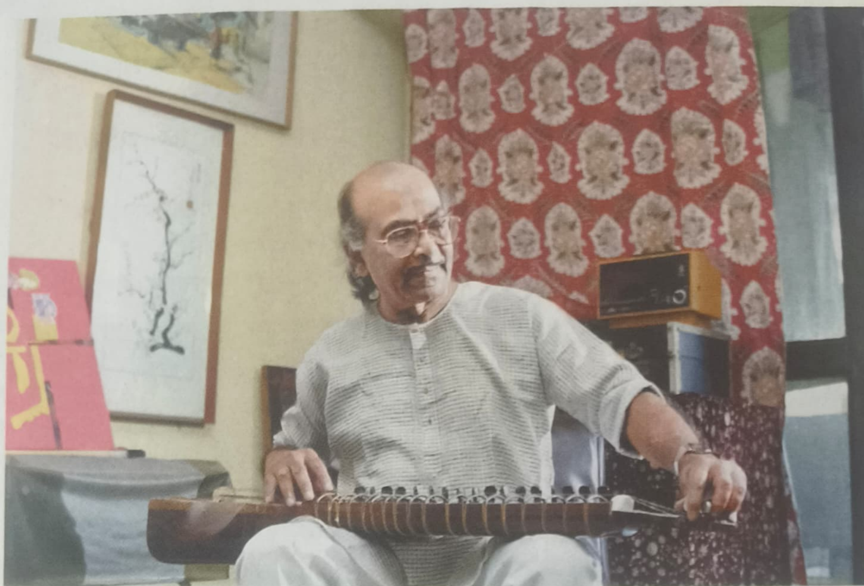
দেখলাম শহরটাকে। সেই ১৩ বছর — আমার জীবনের দীর্ঘতম ছুটি, তবু কাজভরা, সুরভরা।

জীবনের গান, জন্মের গান

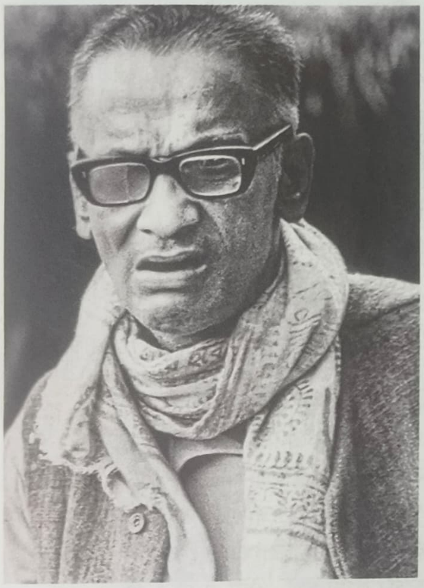
একবার এইচএমভি স্টুডিয়োতে তিনি নিজের হাতে প্রতিটি গানের পরিচয় রেকর্ড করছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে আমি অর্বাচীনের মতো ফুট কাটছিলাম। 'এই কথাটা এরকম হলে কেমন হয়', 'ওটা এমন করছেন কেন...' টাইপের। উনি একদম বকলেন না। চটলেন না। শুধু মৃদু হেসে বললেন, "এই গানগুলো তোর জন্মের বহু আগে তৈরি। চারের দশকের অস্থির সময়ে। আর গানগুলো তো আমি ওই সময়ের হাত ধরে বুনেছি, যাকে বলে 'রক্তে বোনা ধান'। ফলে আমি যেটা করছি, বোধ হয় ঠিকই করছি।" সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর কথায় ইতিহাস খুলে যেত চোখের সামনে। নৌবিদ্রোহের ধ্বনি, ধানের গন্ধ, জনতার গান। কীভাবে সেসবের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন সলিলদা... সব বলতেন। কীভাবে সৃষ্টি করতেন গান, বলতেন সেই গল্পও। আমি বুঝতাম, গান কাগজে লেখা হয় না, মানুষের ভেতরেই লেখা থাকে। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যে সলিলদা বুঝতে



দেবজ্যোতি মিশ্র



নিজের বাড়িতে, অবসরে। (নীচে) বিজন ভট্টাচার্য



বিজনের ছায়াটা আলাদা হয়ে গেল। সেই দরিদ্র মুখ, সেই রাগে-জ্বলা চোখ বলল, "সলিল, তুই এখন বড় লোক হইয়া গ্যাসস।" সলিলদা নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন থিয়েটার থেকে।

পারলেন যে, বাংলা সাহিত্য-কবিতার সঙ্গে আমার একটা যোগ আছে। আর সেই কারণে ওঁর লেখার প্রথম পাঠক হয়ে গেলাম আমি! একটা সময়ের পরে আমার উপরই দায়িত্ব ছিল লেখাগুলো ছাপাখানায় পৌঁছনোর। আসলে সলিলদার সঙ্গে আমার সময়েরা থেমে আছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। এক-এক জায়গার এক-এক রকম সুরের ওঠাপড়া। সলিলদার জীবন তাঁর সুরের মতোই বিচিত্র পথের অধিকারী। দিল্লির শীত তখন ধীরে ধীরে শহরটাকে ঘিরে ফেলেছে। সফদরজং এনক্লেভে আমরা মাত্র দু'জন। সলিলদা আর আমি। ছোট্ট ঘরে আগুন জ্বলছে। কাঠের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। বাইরে কুকুরের ছানারা কাঁদছে, হয়তো তাদের মা শরীর দিয়ে ঢেকে রাখছে, যতটা পারে। সলিলদা চুপচাপ আগুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মায়েরা কখনও বিশ্বাস করে না নিজের ব্যর্থতাকে, জানো? ঠিক যেমন যারা মানুষের হয়ে কাজ করে, তারা কখনও হাল ছাড়ে না।"

তাঁর চোখে তখন আলো আর অন্ধকারের এক মিশ্র দীপ্তি। আমি বুঝছিলাম, এই মানুষটা আগুন চিনেছেন নিজের ভেতরেই। রাত গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমরা তখন বিশিষ্ট সুরকার অনিল বিশ্বাসের বাড়িতে। টেবিলে বসে আছি, পাশে তাঁর রান্নার লোক রামু, মুখে সরল হাসি। খাওয়ার গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। যেন নতুন ধানের গন্ধ। সলিলদা অতীতের গল্প বলছিলেন, এক একটি গল্প যেন গলে পড়ছে সময়ের গ্লাসে। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, গণনাট্য, বিজন ভট্টাচার্য... একে একে উঠে আসছিলেন সবাই। আমি শুধু শুনছিলাম আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলাম। যেন এক ছাত্র প্রশ্ন করছে তার গুরুজনকে।

বিজন ভট্টাচার্যের কথা তুলতেই সলিলদার মুখটা বদলে গেল। তিনি বললেন, "ও ছিল আগুনের মানুষ।" আমি দেখলাম তাঁর চোখে একটা থিয়েটার জেগে উঠছে। মঞ্চে বিজনদা দাঁড়িয়ে, নীচে সলিলদা। আলোগুলো ম্লান, কুয়াশার ভেতর থেকে আসছে বুটের শব্দ। দু'জন মানুষের ছায়া মিশে যাচ্ছে গণনাট্যের আলোয়। তারপর, ঠিক এক মুহূর্তে, বিজনের ছায়াটা আলাদা হয়ে গেল। সেই দরিদ্র মুখ, সেই রাগে-জ্বলা চোখ বলল, "সলিল, তুই এখন বড় লোক হইয়া গ্যাসস।" সলিলদা নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন থিয়েটার থেকে। গাড়ির দরজা খুলতেই এক গন্ধ — পারফিউমের গন্ধ — যেন বিজনের মুখ হয়ে উঠল। অন্ধকারে একটা প্রশ্ন ভাসছে, "কী



হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে সবিতা-সলিল

দ্যাখস, সলিল? বিজনদা ভিক্ষা করতাসে, তাই দ্যাখস?"
আমি জানি, সেই প্রশ্ন শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মনে থেকে ছিল।
গণনাট্য তখন লড়াই করছে দেশের জন্য, মানুষের জন্য। কিন্তু লড়াইয়ের ভিতরেও ফাটল ছিল।
সলিলদার গান 'পালকি', 'গাঁয়ের বধূ', 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে'... একে-একে নিষিদ্ধ হল। কারণ তিনি লিখেছিলেন সত্যি কথা। ক্লান্ত মানুষের কথা। আশাহারা বধূর কথা। তাঁদের কাছে তা বিপ্লব-বিরোধী মনে হয়েছিল। কিন্তু সলিলদা বলেছিলেন, "আমি তো মানুষের সুরকার। মানুষের সত্য যদি ক্লান্ত হয়, সেটাকেও কি বাদ দেব?" তাঁর কথায় একটা মৃদু হাহাকার ছিল। এই হাহাকারই যেন কোমল গান্ধার।

মতানৈক্য, পলায়ন ও বিপ্লব

রাতের গল্প বাড়ছিল। আগুন নিভে এসেছে, কিন্তু ঘরে যেন অন্য আগুন জ্বলছে।
তিনি বললেন, "আমি বোম্বেতে পালিয়ে এসেছি, পালিয়ে এসেছি ওদের থেকে।"



স্ত্রী সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে

আমি চুপ করে ছিলাম। সেই রাতে সলিলদা ভেঙে পড়েছিলেন, একদম শিশুর মতো। আমি শুধু পাশে বসে ছিলাম, তাঁর কাঁধে হাত রেখে। হয়তো আমার ভাগ্যই আমার কাঁধে হাত রেখেছিল সেদিন!

সময় কেটে গেছে। অনেক পরে আর একদিনের ঘটনা। আমরা রোল্যান্ড রোডে, কবি অনন্য রায়ের ঘরে। 'সুবর্ণরেখা' চলছে পর্দায়। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনা। সলিলদার বন্ধু। ছবির দৃশ্যে বিজন ভট্টাচার্য, তাঁর চরিত্রের



মৃণাল সেন ও বাসু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সলিল

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গেও সলিলদার মতভেদ ছিল। হেমাঙ্গ বলতেন, "বিপ্লবের গান হতে হবে বাংলার মাটির গান দিয়ে।" সলিলদা বলতেন, "কেন? বেঠোফেনের সুর দিয়েও তো..."

নাম হরপ্রসাদ। তিনি যেন গণনাট্যেরই প্রতিধ্বনি। স্ক্রিনে হরপ্রসাদ বলছেন, "আমরা ঠকে গেছি।"
সলিলদা নীচু গলায় বললেন, "এই কথা বলেই তো ওরা আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।" আমি দেখছিলাম, সলিলদা যেন সিনেমা দেখছেন না, নিজের ইতিহাস দেখছেন। ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঝড়ের মতো। ঋত্বিক একবার অনেকটা ভদকা খেয়ে বলেছিলেন, "আর কখনও মদ ছোঁব না।" তারপর তাঁদের জীবনে ঢুকে পড়ল অন্য রকম নেশা—গান, সিনেমা, বিপ্লব, ভালবাসা। আমি জানি, সেই নেশাতেই তাঁরা বেঁচেছিলেন। আর হয়তো সেই নেশারই নাম ছিল—গণনাট্য। কিন্তু তারপর সেই সম্পর্কও অন্য দিকে মোড় নিল। একদিন সলিলদা আমাকে বললেন, "ও আমাকে 'কোমল গান্ধার'-এর জন্য প্রেমের গান লিখতে বলেছিল। লিখেছিলাম। নিতে এল না। পরে সেই গানটা হয়ে গেল 'ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা।' হেসে বললেন, "ঋত্বিককে আমি ঝড় বলে ডাকতাম।"
সলিলদার সেই হাসির নীচে ছিল অদ্ভুত মায়া, আর একটুখানি বেদনা।
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গেও সলিলদার মতভেদ ছিল। হেমাঙ্গ বলতেন, "বিপ্লবের গান হতে হবে বাংলার মাটির গান দিয়ে।" সলিলদা বলতেন, "কেন? বেঠোফেনের সুর দিয়েও তো ভারতাত্মা বলা যায়!"
সলিলদার বিশ্বাস ছিল, সুরের কোনও দেশ নেই। দেশ হয় না। তিনি বলতেন, "যদি আমাকে দিল্লি যেতে হয়, আমি গরুর গাড়িতে যাব কেন? আমার সুরে থাকতে পারে ট্রেনের গতি, বাঘের অর্গ্যান, আর মানুষের কান্না...সব একসাথে।" আসলে আমার গুরু ছিলেন এক বিদ্রোহী। তিনি সবসময় পালাতে চেয়েছেন। আরামের জীবন থেকে, ছোট পরিসর থেকে, এক বৃহৎ সংগ্রামে। তিনি জানতেন, বিপ্লব মানে শুধু পতাকা নয়; বিপ্লব মানে নিজের ভেতরের আগুনটাকে চিনে ফেলা।
এখন এত বছর পরে বুঝি, সেই সময়টাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ঝোড়ো সময়। এখনও ভায়োলিন হাতে নিলে, দূর থেকে যেন শুনি সলিল চৌধুরী বলছেন, "তুমি ভাল বাজাও।"



■ মহম্মদ রফির সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানের মাঝে

সলিলদা মানে আমার কাছে এক বিস্ময়ের বই। আমি প্রতিদিন সেই বইয়ের পাতা ওল্টাই। মনে হয় কিছুই করে উঠতে পারিনি। সলিল সাগরের অতল ছুঁতে পারলাম কই!

মানুষের মতো মানুষ

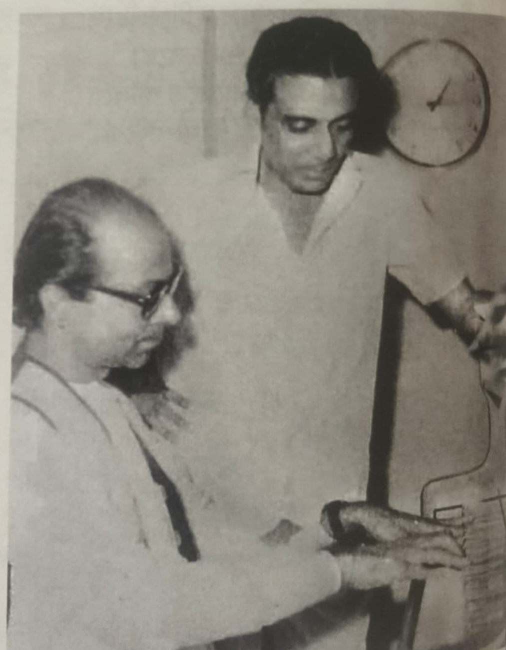
আসলে তাঁর মতো বন্ধুবৎসল মানুষ আমি কখনও দেখিনি। আর কী ভীষণ ক্ষমাশীল! কত মানুষ কত ঘটনা ঘটিয়ে চলে গেছে, কত অসম্মান করে গিয়েছে, কত আঘাত দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে সলিলদার আবার যখন কিছু সময় পরে দেখা হয়েছে, তাদের প্রতি আর কোনও বিরূপ ভাব থাকেনি। কীভাবে যে ক্ষমা করে দিতে পারতেন! ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তাপস সেন, মজরু সুলতানপুরি, শৈলেন্দ্র... আরও কে না কে! বিমল রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং শম্ভু মিত্র ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ।

আজকাল পডকাস্ট হচ্ছে। আরও কত কী নতুন হচ্ছে। কিন্তু আজকের বহু আগে শ্রবণ সাহিত্য শুরু করেছিলেন সলিল চৌধুরী। তিনি যে-কোনও কিছু, যে-কোনও নতুন শুরু করতে পারতেন। তারপর তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের ছিল তা তারা করে উঠতে পারেনি। সেই শ্রবণ সাহিত্যে আসতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মজরু সুলতানপুরি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষ। আসতেন সমরেশ বসু। সমরেশ বসু সলিলদার পাশের বাড়িতে অর্থাৎ 'আকাশ দীপ'-এর পাশের বাড়ি লর্ড স্ট্রিটে থাকতেন। অনেক রাতে একদিন সমরেশ বসু এসেছেন বাড়িতে। সবিতাদিরা তখন বোম্বেতে। তো আমিই জোগাড় করছি সমস্ত কিছু। মানে সন্ধ্যা আহ্নিকের সব উপকরণ থেকে আরম্ভ করে আর বাদ বাকি সমস্ত কিছু আয়োজনের দায়িত্ব, সব আমার। সঙ্গে ছিলেন আমাদের ফোটোগ্রাফার এবং আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুব্রত ভট্টাচার্য। আমরা যখন সমরেশ বসুকে রাত্রিবেলা বাড়ির নীচে নামাতে গেলাম, সলিলদাও এলেন। হঠাৎ দূর থেকে দেখি যে, দুই বন্ধু দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। সমরেশ বসু বলছেন, "মনে আছে সলিল, আমরা দেখতাম ওই দূরের মাঠে বিপ্লব আসছে, গলিতে দাঁড়িয়ে দেখতাম, বিপ্লব আসছে। যে দিকে তাকাতাম, ধস থেকে বিপ্লব আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিপ্লব এল না সলিল।" এই বিদ্রোহে শামিল হয়েও যে বিপ্লব এল না, এই ব্যথা অনুভব করতেন সলিল চৌধুরী। এই সলিল চৌধুরী আমার কাছে এক অনন্য সলিল।

দূরগত তারা

আসলে সলিলদাকে দু'ভাবে দেখতে হয়। এক, তিনি স্নেহশীল পিতা। তিনি আমার পিতা। তাঁকে ছাড়া আমার জীবনের কোনও অংশই সম্পূর্ণ হয় না। আবার অনেক দূর থেকে ঠিক যেরকমভাবে এভারেস্টকে দেখতে হয়, না হলে তাকে ভাল করে দেখা যায় না... শিল্পী সলিল চৌধুরীকে ঠিক সেভাবেই দেখা উচিত। ভারতবর্ষের সঙ্গীতের অনন্য এই স্রষ্টার জীবন ২০৫০ সালেও কি এরকম ভাবে আমরা দেখব? আমরা কী করে সলিল চৌধুরীর গানকে সারা পৃথিবীর মঞ্চে নিয়ে যাব, সেটাই হল আসল কথা। সলিলদা বলতেন, "দেখিস, আমার জীবৎকালে হবে না। কিন্তু একদিন আমি যখন থাকব না, তখন মানুষ আমার গান গাইবে।"

সলিল চৌধুরী সম্পর্কে বলতে বললে, আমার



■ কাজের মাঝে শ্যামল মিত্র ও সলিল চৌধুরী

বলা কোনওদিন শেষ হয় না। কারণ যতদিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি, এই বটগাছ আরও প্রসারিত হচ্ছে। বহু বহু ছোট-ছোট গাছকে স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলবে। ঠিক আজকে, এই মুহূর্তেও না ঘটলে আমি বিশ্বাস রাখি যে, একদিন আসবে, যেদিন সলিল চৌধুরীর গান তাঁর জীবন, তাঁর বেঁচে থাকা, তাঁর কবিতা... সমস্ত কিছুকে মানুষ বুঝতে পারবে এবং তা নতুন প্রজন্ম তৈরি করবে। আমি বিশ্বাস করি আমার পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সলিল চৌধুরীই পথ দেখাবেন। যেরকমভাবে ১৮ বছর বয়সের আমাকে আলোর পথ



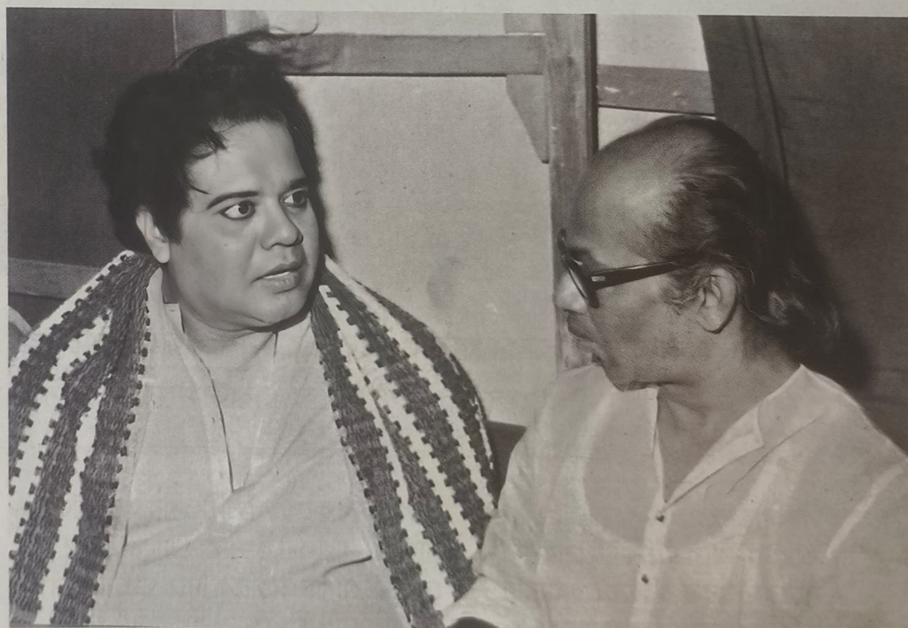
একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা

আসলে ঘটনাটা হল সেদিনের একজন শ্রোতা শুধু বলেছিলেন 'গাঁয়ের বধূ' গানটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এই সামান্য মন্তব্যটুকু যেন কাঁপিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। কারণ সলিলদা ভেতরে-ভেতরে সবসময় অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে মানুষ জেগে থাকবে, প্রতিবাদ করবে, ভালবাসবে। নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার সেই অদম্য স্বপ্নটাই তাঁকে কষ্ট দিত। সেই স্বপ্নটাই আবার তাঁকে বাঁচিয়েও রাখত। আমি দেখেছি, সোনারপুরের কাছে কোদালিয়া গ্রামে, একটা সাধারণ অনুষ্ঠানে সবাই যখন বললেন, "নতুন করে আবার গণসঙ্গীত করুন না, দাদা!" সলিলদার মুখে আগুনের মতো দীপ্তি জ্বলে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন খুব শান্ত গলায়, "চারিদিকে যা দেখছি, আপনাদের মধ্যে তো কোনও প্রতিবাদ দেখি না, কোনও আন্দোলন দেখি না! গণসঙ্গীত কি ছেলের হাতের মোয়া!" কথাগুলো বলার পরেও তাঁর চোখে ছিল বেদনার মৃদু আলো। তবু তিনি হাল ছাড়েননি। নতুন কিছু করার, নতুনভাবে ভাবার সেই অন্তর্গত তাগিদটা আজও আমার কানে বাজে। আমি সেদিন বুঝেছিলাম, সলিল চৌধুরীর মতো মানুষরা আসলে মাটি থেকে তৈরি, কিন্তু আলোয় বাঁচেন। তাঁর পাশে বসে

আমি ছুটে গিয়ে পাইপটা সরাতে গিয়েছি। দেখি, সলিলদার চোখ ভিজে গেছে। হাতে লাইটার কাঁপছে, নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "আমি আর...

দেখিয়েছেন। আসলে যে বিশ্বাস তিনি নিজের মধ্যে বপন করেছেন সারাজীবন, তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সকলের মধ্যে। হয়তো তাতে দ্বিধা ছিল, কিন্তু অসততা ছিল না। নিজের শিল্পের প্রতি অসৎ সলিলদা কোনওদিন হননি।

একটা দিনের কথা দিয়ে শেষ করি। সময়টা সম্ভবত ১৯৮৫ সাল। রবীন্দ্র সদনে একটা অনুষ্ঠান ছিল। সবকিছু ঠিকঠাক গেলেও, কিছু একটা অসুবিধে হয়েছিল মঞ্চে। সলিলদা সেদিন খুব চুপচাপ। হঠাৎই ফিরে এসেছিলেন নিজের ফ্ল্যাটে। সঙ্গে আমিও ফিরে এসেছি। সবিতাদি, অন্তরা, আরও কয়েকজন গিয়েছেন পার্ক স্ট্রিটের একটি চাইনিজ় রেস্তরাঁয়। আমি আর সলিলদা ড্রয়িংরুমের মুখোমুখি দু'টি সোফায় বসে আছি। রাত গভীর, জানালার বাইরে আলো নিভে যাচ্ছে একে একে। ঠিক তখনই সলিলদা এসে বসলেন। একটা পাইপ ধরালেন। লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালালেন। হঠাৎ দেখি, ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছোট-ছোট আগুনের ফুলকি উঠছে। আমি ছুটে গিয়ে পাইপটা সরাতে গিয়েছি। দেখি, সলিলদার চোখ ভিজে গেছে। হাতে লাইটার কাঁপছে, নিয়ন্ত্রণ নেই।



তরুণকুমারের সঙ্গে

আমি নীচু হয়ে বললাম, "দাঁড়ান, সলিলদা, হয়ে যাবে।"
তিনি তাকালেন আমার দিকে। এক সরল শিশুর চোখে, অদ্ভুত শান্তি। তারপর খুব ধীরে বললেন, "আমি আর 'গাঁয়ের বধূ'র মতো গান লিখতে পারব না রে।"

আমি বুঝেছিলাম, রেনেসাঁ মানে শুধু যুগান্তর নয়, রেনেসাঁ মানে হৃদয়কে জ্বালিয়ে মানুষকে জাগিয়ে তোলা। সেই আগুন জ্বালিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী।



■ হৈমন্তী শুক্ল ও সলিল চৌধুরী

আমার রাঁধা চিকেন স্টু খেতে ভালবাসতেন

সলিলদা যখন হালকা খাবার খেতেন, তখন ওঁর জন্য চিকেন স্টু বানিয়ে নিয়ে যেতাম। পানের সঙ্গে আমার পছন্দের জর্দা খেতে ভালবাসতেন। স্মৃতি রোমন্থন করলেন **হৈমন্তী শুক্ল**

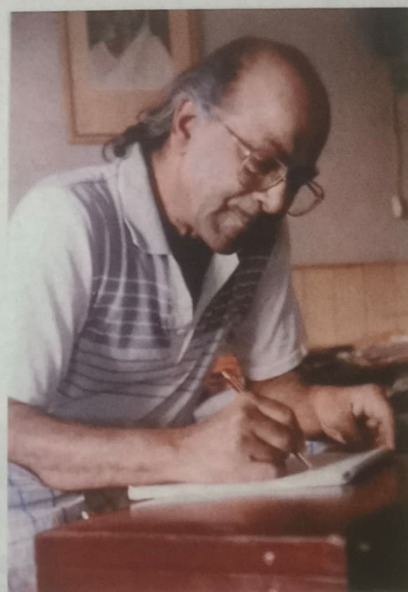
সলিলদার সঙ্গে আমার আলাপ আটের দশকের একদম শেষ বা নয়ের দশকের শুরুতে। প্রথমবার উনি একটি হিন্দি গানের জন্য আমাকে ডেকেছিলেন। উনি সলিল চৌধুরী, ওঁকে তো জগৎ সংসার চেনে। ছোটবেলা থেকে ওঁর গান শুনে বড় হয়েছি। 'সাত ভাই চম্পা' গানটি শুনে মনে হয়েছে, মানুষটির কাছাকাছি যদি যেতে পারতাম! উনি খোঁজ রাখতেন উঠতি শিল্পীদের। বাবার কাছে যে আমি গান শিখেছি, সবই জানতেন। এইচ এম ভি থেকে আমাকে যোগাযোগ করেছিল সলিলদার কম্পোজ়িশন গাইতে। সলিলদা হংসধ্বনি রাগে 'দে দে রে সখী' গানটি আমাকে দিয়ে গাওয়ালেন। আদ্যন্ত ক্লাসিক্যাল গান। 'পরিবার' ছবির 'জা জা তোসে না বোলুঁ কনহইয়া'র বাংলা। তখন ওঁর সান্নিধ্য পাই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, 'সলিল চৌধুরী সিগনেচার' গান গাওয়ার। শুনে উনি বললেন, 'তুই তো ক্লাসিক্যাল গাস'। আমি বললাম, 'না দাদা, আমি সবরকম গান গাইতে চাই।' তারপর আমাকে উনি 'এবার স্বপ্নের বন্ধন খুললাম' গানটি দিলেন। যেটা শুনেই বোঝা যায়, সলিলদার কম্পোজ়িশন। তারপর তো ওঁর কম্পোজ় করা প্রচুর গান গেয়েছি। মেয়ের মতোই ভালবাসতেন আমাকে।

সেই সময় উনি বালিগঞ্জের তিভোলি কোর্টে থাকতেন। কোথাও গেলে আমি আবদার করতাম, দাদাকে আমি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেব। একসঙ্গে ফিরতাম আমরা। সলিলদা কোনওদিন এমন হাবভাব দেখাননি যে 'আমি সলিল চৌধুরী'। কখনও ওঁর বাড়ি গেলে, বাকি যাঁরা থাকতেন, তাদের বলে



গান তোলাতেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে

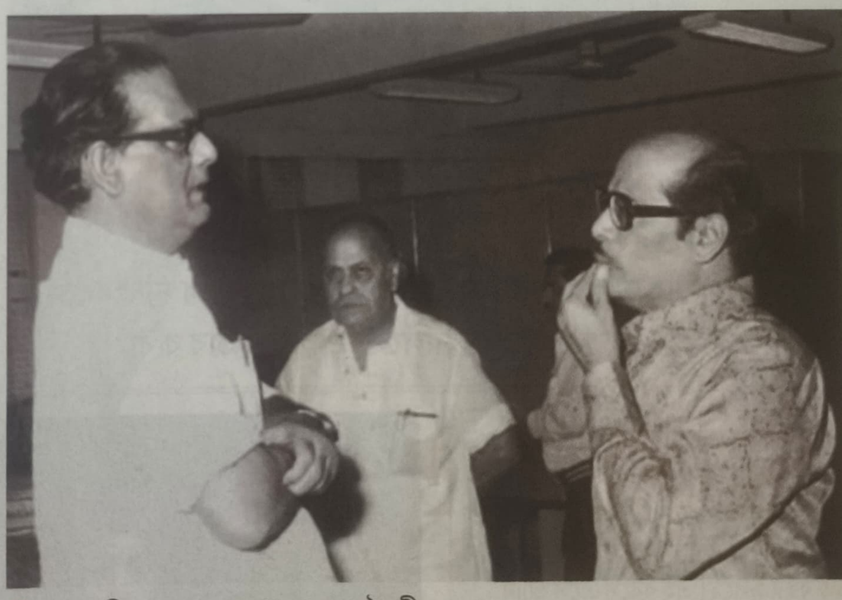
আমি তখন শহরের বাইরে কাজে গেছি। সেবার সলিলদার জন্মদিনে যেতে পারিনি, বলেছিলাম পরের বছর যাব। কিন্তু পরের বছর দাদা আর আমাদের মধ্যে থাকলেন না



গীতিকার সলিল

দিতেন, 'তোমরা এখন যাও, আমি হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলব।' অনেকে বলেন, সলিল চৌধুরী ভাল গায়ক নন। কিন্তু আমার তা মনে হয়নি। উনি যেভাবে গান তোলাতেন, ওঁর গায়কিটা যদি কেউ নকলও করতে পারে, তা হলেও ভাল গাইতে পারবে। গান তোলাতেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে। কিন্তু আমি ওঁর বাঁশি, এসরাজ, পিয়ানো বাজনো শুনেছি। দারুণ বাজাতেন তিনি। তবে এ ছাড়াও অনেক বাদ্যযন্ত্র তিনি অনায়াসে বাজিয়ে ফেলতেন। আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই সলিলদার কাছে গান শিখতে যেত। যার যখন গান রেকর্ড করার থাকত, উনি গান তোলাতেন। যেমন আমার সময়ে, সৈকত মিত্র যেতেন। গান শেখাতে-শেখাতে হঠাৎ করে বলতেন, 'দাঁড়া, একটু খাবার নিয়ে আসি।' চট করে কিছু একটা বানিয়ে নিয়ে আসতেন। শেষের দিকে ওঁর শরীর যখন সঙ্গ দিত না, তখন হালকা-পাতলা খাবার খেতেন। স্টুডিয়োতে রেকর্ডিং থাকলে আমি দাদার জন্য চিকেন স্টু বানিয়ে নিয়ে যেতাম। সেটা খুব তৃপ্তি করে খেতেন।

দাদা শুধু যে এখানকার শিল্পীদের খোঁজ রাখতেন, তা নয়। উনি বিশ্বের সমস্ত রকম গানের শিল্পী, মিউজ়িশিয়ানদের কাজকর্ম নিয়ে



হেমন্ত, সলিল ও মান্নার সুরে গান গেয়েছেন হৈমন্তী

খোঁজ রাখতেন। সেটা নিজের গানে প্রয়োগ করতেন। সেটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। ওঁর গানে পাশ্চাত্য মিউজ়িকের ছাপ তো খুবই স্পষ্ট।

আমি তখন পানের সঙ্গে খুব জর্দা খেতাম। একদিন খাচ্ছি, আমার থেকে চেয়ে খেলেন। বাজারচলতি জর্দার চেয়ে ওটা একটু আলাদা, তাই ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ওঁর তো পানের নেশা ছিল না। মাঝে মধ্যে একটু আধটু খেতেন। কিন্তু পানের সঙ্গে ওই জর্দাটা ওঁর চাই। ওঁর কাছে গান তুলতে গেলে বা স্টুডিয়োতে রেকর্ড করতে গেলে আমি সঙ্গে জর্দার কৌটোটা রাখতাম।

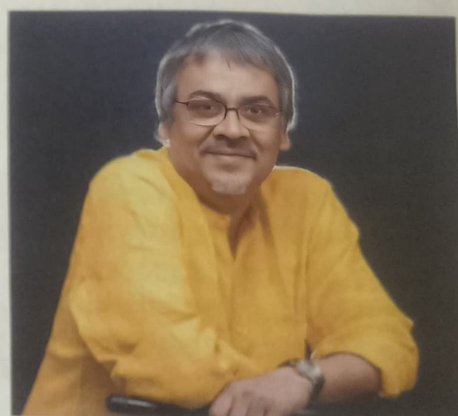
১৯ নভেম্বর ওঁর জন্মদিন। আমাকে একদিন ফোন করে বললেন, 'কাল আমার জন্মদিন। মেয়েরা হইচই করতে চাইছে... তোকে কিন্তু আসতেই হবে।' আমি তখন শহরের বাইরে কাজে গেছি। সেবার যেতে পারিনি, বলেছিলাম পরের বছর যাব। কিন্তু পরের বছর দাদা আর আমাদের মধ্যে থাকলেন না। সেই আক্ষেপটা আজীবন থেকে যাবে।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: অংশুমিত্রা দত্ত



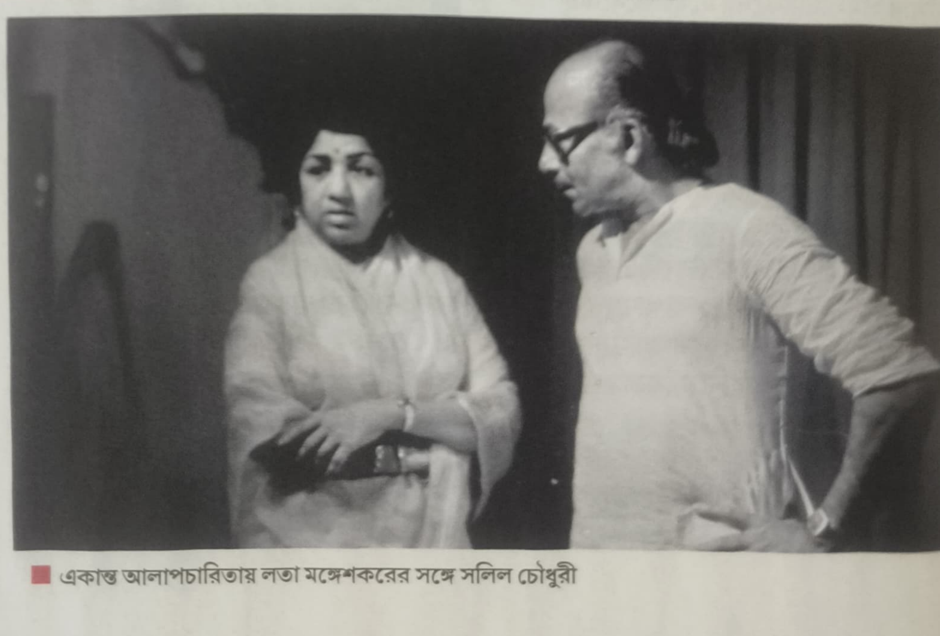
রাজনৈতিক হাতিয়ার

সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীত তাঁর মধ্যে অন্য রকম মুগ্ধতার সৃষ্টি করে।
শ্রীকান্ত আচার্য্য বললেন সলিলের প্রাসঙ্গিকতার কথা



■ শ্রীকান্ত আচার্য্য

সলিল চৌধুরীর সুরসৃষ্টি নিয়ে কিছু বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। ফলে এই প্রতিবেদনে আমি যা লিখব, তা নিতান্ত তাঁর অনুরাগী হিসেবে। আমার এখন ৬৩ বছর চলছে। এই বয়সে এসে আমি একটা কথা সোচ্চারে বলতে চাই। সুরকার হিসেবে সলিল যে অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছেন, তা এই দেশে আর কোনও সুরকার করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। প্রথমত, সুরের চলন দিয়ে স্বকীয়তা তৈরি করা খুব সহজ বিষয় নয়। সলিল সেটা করতে পেরেছিলেন, প্রথম জীবন থেকেই। তাঁর নিজস্ব সিগনেচার তৈরি করে দিয়েছিল ওই সুরগুলো। শ্রোতারা যদি খুব মন দিয়ে সলিলের তৈরি করা ছোটদের গানও শোনেন এবং পরে আলোর পথযাত্রীর মতো গান শোনেন, তা হলে বুঝতে পারবেন, আমি কী বলতে চাইছি। প্রতিটি গানের প্রিলিউড শুনেই বোঝা যায়, কোন গান হতে চলেছে। সলিল এই ছাপ শুধু একটি বা দু'টি নয়, নিজের প্রায় সমস্ত গানেই রাখতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যেমন এসেছিল, সলিল চৌধুরীর মধ্যেও এসেছিল। এবং দু'জনেই নিজেদের মতো করে তাকে সুরের বিন্যাসে ঢেলেছিলেন। তবে সলিল কোথাও সময়ের চেয়ে এগিয়ে যান। কেন? কারণ তাঁর গান কোথাও শুধু সুর সৃষ্টি করেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সুর ও অর্কেস্ট্রেশন সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, 'কী যে করি দূরে যেতে হয় তাই' বা 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে' গানের কথা। ইন্টারলিউড ছাড়া গানটাকে ভাবা যায় না। এমনকি অর্কেস্ট্রেশনও গানটির অনেক না-বলা কথা ছবির মতো এঁকে দেয়। একটা অবয়ব তৈরি করে দেয় গানগুলোর ভোকাল অর্কেস্ট্রেশন। এটা সলিল ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে



■ একান্ত আলাপচারিতায় লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে সলিল চৌধুরী



■ সবিতা, অন্তরা ও সলিল



■ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

আমি অন্তত জানি না। এবং অদ্ভুত ব্যাপার হল, এই প্রভাব ছেড়ে আমরা বেরোতেও পারছি না। তাই সলিল আমার কাছে সম্পূর্ণ একজন কম্পোজ়ার। হতে পারে, সলিলের গণসঙ্গীত ও সিনেমার সঙ্গীত তৈরির ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা ছিল। অ্যাপ্রোচের। সিনেমার খাতিরে অনেক সময়, বাণিজ্যের কথা ভেবে গান তৈরি করেছেন তিনি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'ও আলোর পথযাত্রী' বা 'জাগো মোহন প্যায়ারে' সাঙ্গীতিক নির্মাণ হিসেবে অনন্য। যদি শুধু সুরের ডিজ়াইনের কথা ভাবি, তা হলে বলতে পারি, সিনেমাকে ছাপিয়ে যায়, সলিলের সিনেমার গান। সিনেমার চেয়ে বড় বলে মনে হয়। এখানেই তাঁর সার্থকতা। তবে এটাও স্বীকার করতে বাধা নেই, সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীত আমার কাছে সব সময় অন্য রকম ভাল লাগা নিয়ে আসে। ভাবতে ভাল লাগে, একজন মানুষের নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি অটল থাকাটাতে। সলিলের গণসঙ্গীত যে রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে তৈরি, সেটা আজ প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে হয়তো, কিন্তু সেই সঙ্গীতে এমন কিছু কথা বলা আছে, যা আমার কাছে ভীষণভাবে শাশ্বত। এবং আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, আমরা যে লড়াইগুলো আগে লড়েছিলাম, নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য, আবার সেগুলোকে লড়তে হবে। অচিরেই লড়তে হবে। আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এবং দ্বিধাহীনভাবে সেই সময়ে মানুষকে আবার সলিল চৌধুরীর কাছে ফিরতে হবে। হাতিয়ার হিসেবে আপন করে নিতে হবে তাঁর সঙ্গীতকে।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: সায়ক বসু

সলিল সুরে

আনন্দলোকর-এর পছন্দে
সলিলের কিছু অনবদ্য সৃষ্টি

হিন্দি

সুহানা সফর অউর ইয়ে মওসম
না জিয়া লগে না
অ্যায় মেরে প্যায়ারে ওয়তন
না জানে কিউ
ইতনা না মুঝসে তু প্যায়ার বড়া
কহী দূর জব দিন ঢল জায়ে
জানেমন জানেমন তেরে..
জাগো, মোহন পেয়ারে
কোই হোতা জিসকো অপনা
তসবীর তেরী দিল মেঁ
আজা রে পরদেসী

বাংলা

কোনও এক গাঁয়ের বধূ
বিচারপতি তোমার বিচার
ও আলোর পথযাত্রী
যা রে উড়ে যা রে পাখি
পথে এবার নামো সাথী
ঢেউ উঠছে কারা টুটছে
বাজে গো বীণা
যা রে, যা রে উড়ে পাখি



এক বিস্ময় প্রতিভা

কীভাবে পেলেন তিনি এত প্রাণশক্তি? পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় তৈরি করলেন নিজের সঙ্গীত। তা হয়ে উঠল এই বঙ্গে বাম আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্র। লিখেছেন **চন্দন সেন**

সলিল চৌধুরী সম্পর্কে আমার কিছু বলতে যাওয়া নিতান্ত বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না! আনন্দলোকের অনুরোধ রাখতে গিয়ে আমাকে সেই বাতুলতাই করতে হচ্ছে! সঙ্গীত সম্পর্কে আমার জ্ঞান সঙ্গীত সাগরের বাষ্পীভূত একটা কণা মাত্র! শুদ্ধ-কোমল-তীব্র মিলিয়ে মোট ১২ টি স্বর সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন আমার মা, আরও যে দু'জনের কাছে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, ছাত্র হিসেবে ডাহা ফেল মারা এই ছাত্রের তাঁদের নাম উচ্চারণ করে তাঁদের অপমান আর নাই বা করলাম! কিন্তু সলিলকে নিয়ে লিখতে রাজি হয়ে গেলাম, একটাই কারণে। ছাত্র রাজনীতির সময় থেকে এখন পর্যন্ত, সলিলের গান এমন বিপুল অভিঘাত তৈরি করে দিয়েছে আমার মনে যে, এখনও তো তার রেশ কেটে বেরোতে পারলাম না! সঙ্গীত যে সত্যিই বিপ্লবের অস্ত্র হতে পারে, তা তো রবীন্দ্রনাথের পর সলিল চৌধুরীই বুঝিয়েছিলেন আমাদের। বাম আন্দোলনের উত্থানে গণনাট্য সংঘের ভূমিকার কথা যেভাবে থাকবে, তার সদস্য হিসেবে সলিলের গানও থেকে যাবে।

সলিল চৌধুরী আমার কাছে অনন্য। কারণ, পৃথিবীতে যে ক'জন স্বশিক্ষিত সঙ্গীত প্রতিভা আছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ছোটবেলায় বাবার রাখা গ্রামাফোনে এদেশি এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেকর্ড চোঙায় কান দিয়ে শোনা থেকে তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণার শুরু। তারপর কলকাতায় এসে জেঠতুতো দাদার অর্কেস্ট্রা দল 'মিলন পরিষদে' নানারকম বাদ্য যন্ত্র, পিয়ানো, বেহালা, এসরাজ বাজাতে শেখা। নাড়া বেঁধে তবলা শেখা ছয় বছর বয়স থেকে বিশ্বনাথ কুণ্ডুর কাছে। তুলসী লাহিড়ীর ভাই গোপাল লাহিড়ীর কাছে শিখেছিলেন বাঁশের বাঁশি। ইন্টারকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন, এসরাজ ও বাঁশিতে, পরপর তিনবার। তিমির বরণের অর্কেস্ট্রাতেও বাঁশি বাজিয়েছেন। স্কুল জীবনটা কেটেছে সোনারপুরে, সেখানে পরিচিত হয়েছেন যাত্রাগান, ভাটিয়ালি, মেয়েদের ব্রতকথা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢপ ও পুতুলনাচ দিয়ে। কিন্তু সেই মানুষটিই কিনা মেহনতি মানুষের গান বাঁধলেন! সলিল চৌধুরী বহু জায়গায় লিখে গেছেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ওঁর মননকে তৈরি করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। অতীব ভক্ত না হলে কি আর রবীন্দ্র গানের রস ছেঁচে এমন মাটির গান তৈরি করা যায়?



চন্দন সেন

আমরা যে সলিল চৌধুরীকে চিনি, তিনি বাম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। সারা জীবন মনে করে এসেছেন, শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতাই

শিল্পীকে বৃহত্তর জগতে, বড় মন এবং মানুষে উন্নীত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি, তেভাগা আন্দোলন তৎকালীন জাতীয় রাজনীতি, সমাজে, দেশে যে সঙ্কট তৈরি করেছিল, তাতে অগ্রণী সৈনিক ছিলেন সলিল। কলেজে ছাত্র রাজনীতি, মেথরদের ইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছেন সুন্দরবনের জঙ্গলে। ব্রিটিশ আর জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে গান লিখে সুর দিয়ে ওঁর সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত। এটা ওঁর নিজেরই স্বীকৃতি। ওঁর ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ ...' দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাওয়া পাঁচঘড়া গ্রামের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখা। আইপিটিএ ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে একের পর এক গান তৈরি করেছেন 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে ...' তেভাগার প্রেক্ষাপটে 'হেই সামালো ধান', 'আমার প্রতিবাদের ভাষা', 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা'র



সলিল এদেশে কয়্যার সঙ্গীত এনেছিলেন বিভিন্ন দেশের কনফারেন্সে গান শুনে

রাশিয়া গিয়ে ওখানকার কয়্যার দেখে দেশে ফিরে সলিল তৈরি করেছিলেন বম্বে ইয়ুথ কয়্যার। সেখানে গাইতেন মান্না দে, মুকেশ, লতা মঙ্গেশকর। তাঁরা কোরাসে গলাও মেলাতেন!



গণসঙ্গীতে সলিল এক বিস্ময় প্রতিভা। সেরকমই এক রিহার্সালে

মতো বহু গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন ১৯৩৯ সালে 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ' রেকর্ড করছেন, সলিল তখন সন্দেশখালিতে লুকিয়ে রয়েছেন গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য, কারণ তখন কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তৎপরবর্তিতে তাঁর একের পর এক বিখ্যাত গান 'পথে এবার নামো সাথী', 'পালকির গান', 'রানার', 'অবাক পৃথিবী', 'আলোর পথযাত্রী'... সবই বাম আন্দোলনের শাণিত হাতিয়ার। আমাদের সম্পদ। আমার অবাক লাগে একটাই কথা ভেবে যে, কী মহীরুসম প্রতিভা হলে তবেই, এমন সৃষ্টি করা যায়! পেশাগত জায়গায় শীর্ষে থেকেও সে সময় যা সৃষ্টি করেছেন, সেই গানগুলিও আইপিটিএ-র (গণনাট্য সঙ্ঘ) প্রত্যক্ষ ফসল। ওই সময়ে আইপিটিএ-র বিভিন্ন রাজ্যে কনফারেন্সে যেতেন সলিল। সেখানে শোনা বিভিন্ন গান, সুর ও চলনের জ্ঞান তাঁকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় গান তৈরিতে সাহায্য করেছে। সেই কারণেই মলয়ালি ২৫ টি ছবিতে উনি সুর দিতে পেরেছিলেন। এছাড়া তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, গুজরাতি, কন্নড়, অহমিয়া ছবিতে সুর ও গান তো বাদই দিলাম। রাশিয়া গিয়ে ওখানকার কয়্যার দেখে দেশে ফিরে তৈরি করেছিলেন বম্বে ইয়ুথ কয়্যার। সেখানে গাইতেন মান্না দে, মুকেশ, লতা মঙ্গেশকর। তাঁরা কোরাসে গলাও মেলাতেন! হারমোনিয়ামে স্বয়ং অনিল বিশ্বাসের মতো সঙ্গীত পরিচালক।

সলিল সত্যিই এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টিশীল মানুষ। আজ ও আগামী দিনে যতদিন মানুষের মুক্তির সংগ্রাম চলবে, সলিলের গান মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। মানুষের প্রেমে-বিরহে, আশঙ্কা-হতাশায়, আনন্দ ও দুঃখে সলিল সততই বর্তমান। আছেন ও থাকবেন। নিপীড়িত-শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সলিল প্রশ্ন করেই যাবেন, 'সেদিন আর কত দূরে ...'



১

পুজো -দিওয়ালি শেষ মানেই কি উৎসবেরও শেষ? সেলেব্রিটিদের তো উৎসবের শেষ নেই। তাঁদের নতুন ছবি মুক্তিই যেন একটা উৎসব। আর তাঁদের উৎসবের সঙ্গী

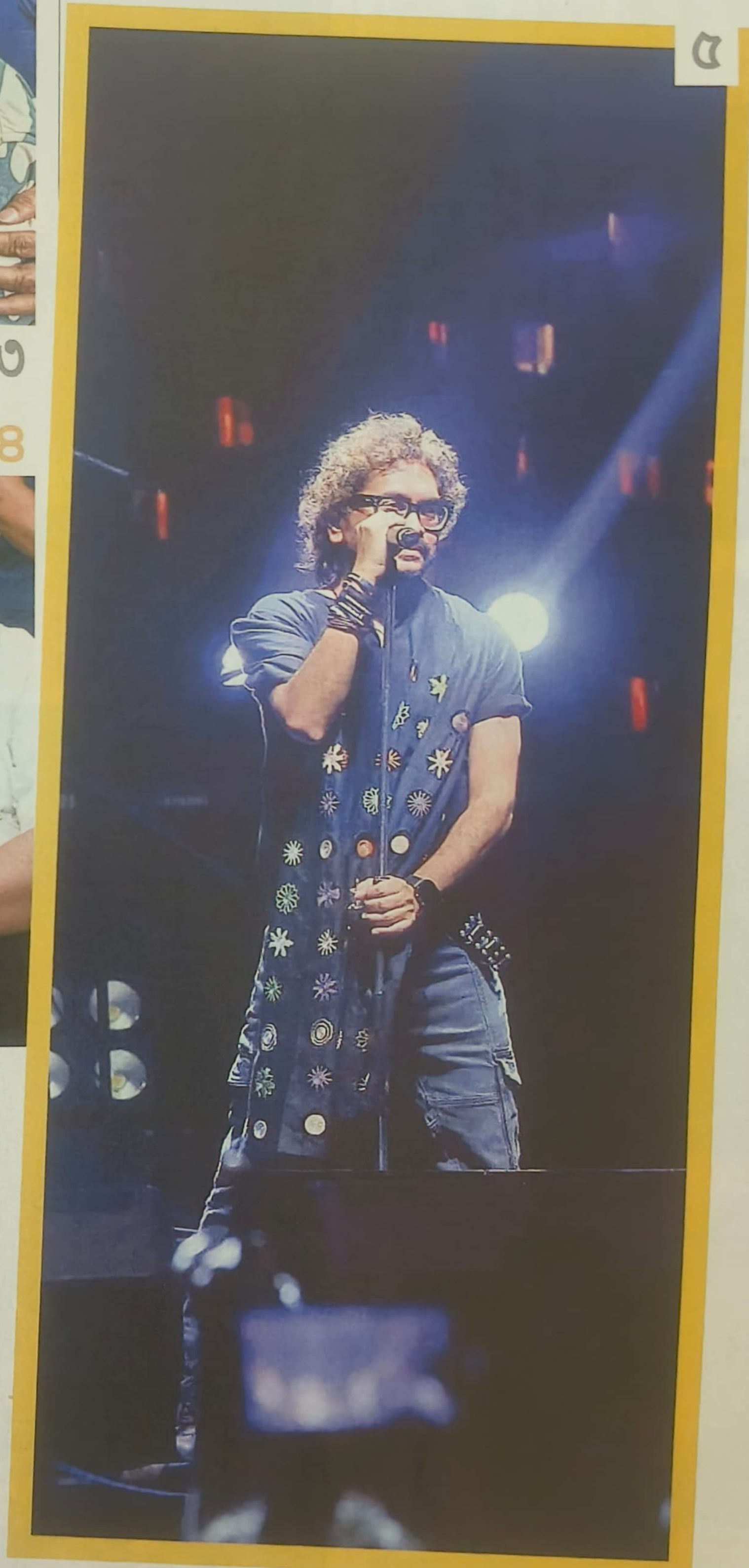
আনন্দলোক

২









১ নিজের জন্মদিনে কেক কেটে সেলিব্রেশন অনন্যা পাণ্ডের

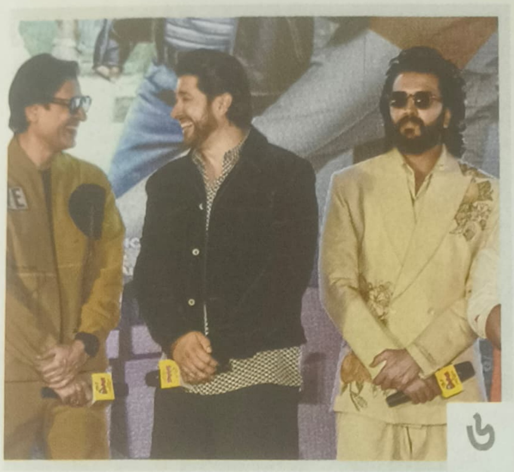
২ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পার্টিতে উপস্থিত রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

&

৩ সেই একই পার্টিতে একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে পোজ় দিলেন ফিরদৌসল হাসান ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৪ বাংলা ছবি 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'-এর ট্রেলার লঞ্চে পাওলি দামের সঙ্গে পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়

৫ কলকাতায় ইউনিটি কনসার্ট-এ পারফরম্যান্সের মাঝে রূপম ইসলাম



৬



৭



৮



৯

৬ মুম্বইতে হিন্দি ছবি 'মস্তি ৪'-এর প্রচারে বিবেক ওবেরয়, আফতাব শিবদাসানি ও রিতেশ দেশমুখ

৭ নতুন বাংলা ছবি 'ডিপ ফ্রিজ'-এর প্রচারে আবীর চট্টোপাধ্যায়

১০



৮ নতুন বাংলা ছবি ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর ট্রেলার লঞ্চে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রুদ্রনীল ঘোষ

৯ ওয়েব সিরিজ় ‘দিল্লি ক্রাইম সিজ়ন ৩’-এর প্রচারে হুমা কুরেশি ও সায়নী গুপ্ত

১০ মুম্বইয়ে একটি ফ্যাশন ইভেন্টে কৃতি স্যানন

১১ একটি নতুন বাংলা রেস্তরাঁ উদ্বোধনে প্রসেনজিতের সঙ্গে দুই কর্ণধার শিলাদিত্য ও দেবাদিত্য চৌধুরী

১১



ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৪, ৮
অনির্বাণ সাহা: ৭

প্রয়োজনে আমিও কাজের প্রচারের জন্য

প্র আগে 'হিট নায়িকা', এখন 'দক্ষ অভিনেত্রী', এই দুটো বিশেষণ আপনার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই দুটোর সংজ্ঞা আপনার কাছে কী?

'দক্ষ অভিনেত্রী' মানে আমি আমার কাজটা নিয়ে খুব সচেতন। কাজটা শিখছি এবং শিখতে পারছি। সততার সঙ্গে কাজ করছি বলে মানুষের মনে আমার কাজ এবং আমার চরিত্রগুলো থেকে যাচ্ছে। আর 'হিট নায়িকা' এবং 'দক্ষ অভিনেত্রী' এই দুটো তো একে অপরের পরিপূরক।

প্র কিন্তু কেরিয়ারর গোড়ার দিকে আপনাকে তো শুধু 'হিট নায়িকা'ই বলা হত...

আমি তো এখনও হিট (হেসে)। মানে আমার শেষ দুটো ছবি কিন্তু হিট দেখুন। কাজে সততা থাকলে, অভিনয়ে তো থাকবেই। আর কাজ ভাল লাগলে চরিত্রের প্রতি ভালবাসাও জন্মাবে। তখন প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেটা দেখবে। ছবি হোক বা সিরিজ়, সেটা জনপ্রিয়তা পেলে মানুষ তখন 'হিট' কথাটা ব্যবহার করে। এবং তখন আমাদের নামের সঙ্গেও সেই তকমাটা যুক্ত হয়ে যায়।

প্র 'পরিণীতা'র মতো ছবি হোক বা 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল', 'অনুসন্ধান'-এর মতো নারীকেন্দ্রিক সিরিজ়... এই ধরণের কাজে আপনার অভিনয়ের হাত ধরে নারীদের চরিত্রায়ণ বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই জার্নিটাকে এখন দায়িত্বের চোখে দেখেন?

দায়িত্ব নয়, নেশা বলতে পারেন। আমি যখন কোনও চরিত্রের জন্ম দিই, তখন নিজেকে নেশাগ্রস্ত লাগে। একটা ঘোরের মধ্যে থাকি। এই জার্নিটা এখন আমার সবচেয়ে বড় নেশা।

প্র যখন এই ধরনের কাজ হাতে পান, তখন পরিচালকের গাইডেন্সের বাইরে গিয়ে নিজের প্রস্তুতির জন্য কী কী করেন?

পরিচালনার বাইরে কিছু হয় না। কারণ টেলিভিশন বা ফিল্ম হল পরিচালকদের মাধ্যম। তাঁদের চোখ দিয়েই আমরা মানে অভিনেতারা কাজকে চিনি এবং বুঝি। তাঁদের তৈরি করা জগতের একটা অংশ আমরা। যে জগৎটাকে



■ ইউভানের জন্মদিনে সপরিবারে শুভশ্রী

এই বছরটা যেন তাঁরই। বড়পর্দায় পরপর মুক্তির পাশাপাশি ওটিটিকেও সমান প্রাধান্য দিচ্ছেন অভিনেত্রী **শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়**। তবে শুধু কর্মজীবন নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও সর্বদা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। নতুন কাজ মুক্তির আগে অভিনেত্রীর মুখোমুখি **সাগরিকা চক্রবর্তী**। শুনলেন তাঁর মনের কথা।

পরিচালনা করেন পরিচালকরা। সেই জগতে আরও অনেক চরিত্রের মধ্যে আমি একজন। কাজ শুরুর আগে আমার প্রথম কাজই হল পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করা। তিনি চরিত্রটাকে কীভাবে দেখতে চান বা কীভাবে চরিত্রটাকে গল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে চান, কীভাবে চরিত্রটাকে প্রেজ়েন্ট করতে চান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর মনটা বোঝার চেষ্টা করি। এবং সেই ভাবনার উপর কাজ করি। সেই মতো গড়ে তুলি চরিত্রটাকে।

প্র আপনি প্রচারে কতটা বিশ্বাসী?

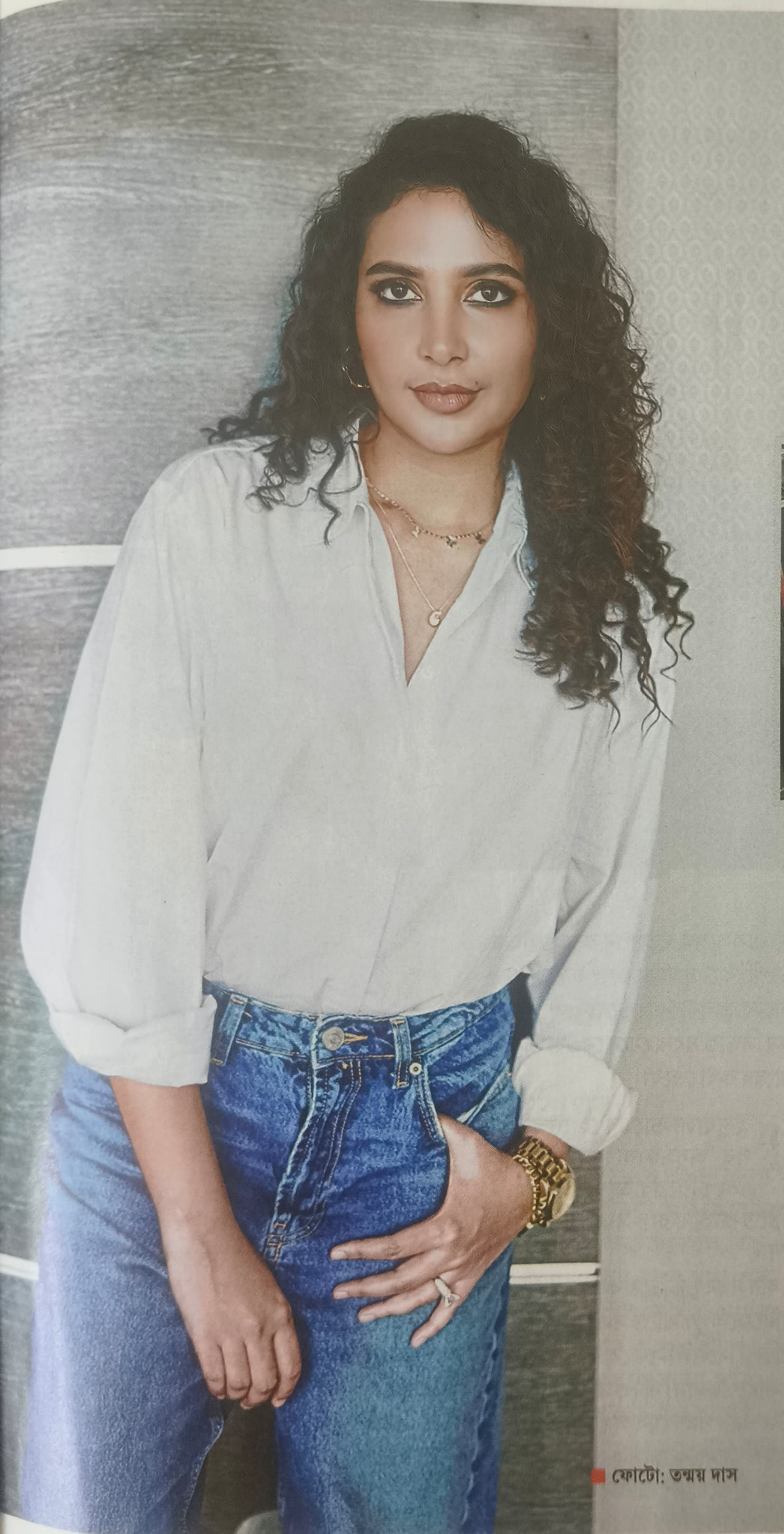
কাজের প্রচার খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবন খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটা মানুষের হাতে ফোন। তাতে একাধিক কনটেন্ট। কোনওটা পছন্দ না হলে নিমেষেই তা সরিয়ে দেওয়া যায়। এত কিছুর মাঝে আমার একটা কাজ আসছে, সেটা দর্শককে জানানো এবং তা ক্রমাগত পিন করে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারবার না জানালে সেই গুরুত্বটা তৈরি হয় না। অন্তত আমি তো সেটাই বিশ্বাস করি।

প্র এখন মিডিয়া-কেন্দ্রিক প্রচারের বাইরে গিয়ে যে বড় ধরনের প্রচারে অভিনেতারা বিশ্বাস রাখছেন, সেরকম গণপ্রচারে আপনারে কখনও দেখা যায়নি। আপনি ওইরকম প্রচারে বিশ্বাস রাখেন?

যে ছবির জন্য যেমন প্রচারের প্রয়োজন, তার একটা টিম থাকে। আমি সেই টিমের কথা মেনে চলি। তারাই সবটা পরিকল্পনা করে। হ্যাঁ আমার ইনপুট অবশ্যই থাকে। আমার মনে হয় আমি যেভাবে প্রচার করি, তাতেও দর্শকদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়। তবে এখনও পর্যন্ত সশরীরে দর্শকদের কাছাকাছি গিয়ে প্রচার আমি করিনি। যদি কোনওদিন মনে হয় আমার ছবি কিংবা সিরিজ়ের প্রয়োজনে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচার করতে হবে, তাহলে অবশ্যই করব।

প্র বর্তমানে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বলি নায়িকাদের আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক, কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমাসহ একাধিক চাহিদা। সন্তানের জন্য দীপিকা পাড়ুকোন এই দাবিগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আপনি একজন

দর্শকদের কাছাকাছি পৌঁছে যাব: শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়



■ ফোটো: তন্ময় দাস

অভিনেত্রী এবং মা হিসেবে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কতটা অনুভব করেন?

এগুলো নিয়ে কথা ওঠার প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে করি না। যে কোনও পেশায় মহিলা, পুরুষের ভেদাভেদের বাইরে গিয়ে মানুষকে প্রাধান্য দেওয়াটা গুরুত্বপুর্ণ। মহিলা নয় একজন মানুষ যদি মনে করেন, সে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করবেন না, বা নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তিনি যদি বেশি পারিশ্রমিক চান, সেই চাওয়ায় ভুল কী আছে? তিনি একজন মেয়ে বলেই কি এত কথা উঠছে?



■ নৈহাটির বড়মার মন্দিরে একসঙ্গে দেব-শুভশ্রী

এগুলো নিয়ে আমারও প্রশ্ন রয়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলব। আমি দীপিকার অনেক আগে মা হয়েছি। ইউভান হওয়ার পর আমি যখন কাজ শুরু করি, তখন আমিও ছোটখাটো বেশ কিছু শর্তেই কাজ করেছি। সময়ের উপরও বেশ কিছু শর্ত রেখেছিলাম। বলিউডের চেয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তো অনেকটাই ছোট। কম সময়ে, স্বল্প পরিকাঠামোতে কাজ করতে হয়। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়। কাজ অনেক দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার চাপ থাকে। অথচ দেখুন, সেই সময় আমি যে সময়সীমাটা বেঁধে দিয়েছিলাম তাতেই সবাই রাজি হয়েছিল। ওই সময়ের মধ্যেই সকলে কাজ করেছে। কখনও কেউ সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। কখনও বলেনি কেন এই খামখেয়ালি, কেন এগুলো মেনে নেওয়া হবে... ইত্যাদি। আমার মনে হয় এগুলো জীবনদর্শন। একজন মানুষ বিপরীতে যে রয়েছে তাকে মানুষ হিসেবে দেখবে নাকি



ফোটো: তন্ময় দাস

মহিলা হিসেবে দেখবে, এটা তার দর্শন। একটা মানুষ যদি বলে, সে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবে না, তাতে অসুবিধে কোথায়!

প্র সম্প্রতি ছবিমুক্তিতে কিছুটা রাশ টানা হয়েছে। কারণ একসঙ্গে একাধিক ছবি মুক্তি পেলেই রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, প্রচারকৌশল ইত্যাদি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বছর পুজোয় যা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এটা নিয়ে একজন অভিনেত্রী হিসেবে আপনি কী বলবেন?

এই জিনিসটা বহু বছর ধরে চলছে। আমি একজন পজ়িটিভ মানুষ। তাই পজ়িটিভভাবেই এই দিকটা দেখি। যেমন ধরুন, পাড়ার একটা ক্লাবে যখন ফুটবল বা অন্য কিছু খেলা হয়, এক দলের লোক অন্য দলের লোককে অনেক ছোট কথা বলে। অথচ তারা একই ক্লাবের মেম্বার। কিন্তু খেলাশেষে যখন প্রাইজ় দেওয়া হয়, তখন আবার একসঙ্গেই উদ্‌যাপন করে। আমরাও একটা পরিবারের মতো কাজ করি। তাই পরিবারের ভালর কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত। এরকম সিদ্ধান্ত সবার মেনে নেওয়া উচিত। পরিবারের কথা ভেবে।

প্র 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর পর 'অনুসন্ধান'। অন্যরকম গল্প এবং চরিত্রের আশাতেই কি ওটিটিতে কাজ করায় সমানভাবে আগ্রহ দেখান?

প্রথম বার যখন ওটিটিতে কাজ করেছিলাম তখন নিজেকে বোঝাতে সত্যিই সময় লেগেছিল। নিজেই নিজেকে অনেক সময় নিয়ে মানিয়েছিলাম। যদিও 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর সময় দেবালয়, শ্রীকান্তদা, এমন কি রাজও আমাকে অনেক ভাবে বুঝিয়েছিল। আমাকে বুঝিয়েছিল ওটিটিতে কত ভাল ভাল কাজ হচ্ছে। কিছু কিছু গল্পের পরিধিই এতটা বড় যে, তা আড়াই ঘণ্টার ছবিতে তুলে ধরা সম্ভব নয়। যা হয়তো ওটিটির মাধ্যমেই তুলে ধরা যায়। আমি তো বরাবর সিনেমাই করেছি। তাই আমার মতো মানুষরা যদি এগিয়ে না আসি, পথপ্রদর্শক না হই, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম এগিয়ে আসবে কী করে।

প্র কাজ নিয়ে যেমন চর্চা হয় একই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও অনেক চর্চা হয়। সম্প্রতি সেরকমই একাধিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন আপনি। ছোট বড় অনেক সমালোচনাকে কাছ থেকে দেখেছেন। এরকম ঘটনা কি কাজের মনোবলকে দুর্বল করে দেয়?

মনোবল দুর্বল করে দেওয়া বা ভেঙে দেওয়ার অধিকার আমি কাউকে দিয়েনি। সেই অধিকার শুধু আমার। অত সাহসও কারওর নেই। তবে হ্যাঁ প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা অভিমত তো থাকবেই। সেটা কেউ আটকাতে পারে না। তবুও সবশেষে আমরা চেষ্টা করি পজ়িটিভ নোটে জীবনটা এগিয়ে নিয়ে যেতে। এবং সম্পর্কগুলো সেরকম



পুজোয় সময় ফ্রেমবন্দি রাজ-শুভশ্রী

পজ়িটিভই থাকুক সেটাই চাই।

প্র কিন্তু সহঅভিনেতা মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে সহকর্মী। তাই সহকর্মীর কাছ থেকে আপত্তিকর মন্তব্য কি কাম্য?

আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই বিষয়টাকে আর বর্ধিত করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা ইতিবাচক দিকটা ভেবে ভাল ভাবেই আবার ১০ বছর পর নতুন করে একটা জার্নিটা শুরু করেছিলাম। তাই এগুলো নিয়ে আর আলোচনায় না গিয়ে আমি চাই, সেই ভাল দিকটা বজায় থাকুক।



■ কৌশিকের সঙ্গে ব্যান্ড 'পরশপাথর'

কৌশিকের হাত ধরে ফিরছে পরশপাথর

আড়াই দশক আগে পর্যন্ত বাংলা ব্যান্ড হিসেবে 'পরশপাথর' বাকি ব্যান্ডগুলোর চেয়ে জনপ্রিয়তায় অনেকটাই এগিয়ে ছিল। কথায় সুরে গানে মাতিয়ে রেখেছিল শহর ও শহরতলির শ্রোতাদের। দুর্ভাগ্যবশত সেই ব্যান্ড ভেঙে যায়। কিন্তু তার সুরের জাদু এখনও মাতোয়ারা করে রেখেছে বাঙালি শ্রোতাকে। সেই ব্যান্ডকে যদি আবার মঞ্চে দেখা যায় তাহলে তো তার চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। এই অসাধ্য সাধনই করলেন কৌশিক চক্রবর্তী ('পৃথিবী'র লিড ভোকালিস্ট)। কিছুদিন আগেই 'পরশপাথর'-এর প্রাক্তন সদস্য অয়নের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন কৌশিক। তখনই বোঝা গিয়েছিল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এবার জানা গেল, আগামী ডিসেম্বর মাসে কেসিসিতে ফিরতে চলেছে 'পরশপাথর'। সঙ্গে 'পৃথিবী'। 'পরশপাথর'-এর পুরনো সদস্য, মানে অয়ন, রাজা, সমিধ, ঋষি, চির, হাম্পটু, পিকলুরা একসঙ্গে পারফর্ম করবেন বছর কুড়ি পরে। এই কনসার্টে তাঁদের সঙ্গে বাজাবে 'পৃথিবী'ও। কনসার্ট নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে শ্রোতাদের মধ্যে।

প্রয়াত সুলক্ষণা

সুর, যন্ত্রণা আর এক অসমাপ্ত প্রেমের গল্প নিয়ে ৭১ বছর বয়সে চলে গেলেন কিংবদন্তি গায়িকা-অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তবে মৃত্যু মিলিয়ে দিল তাঁর প্রেমকে। ৬ নভেম্বরই প্রয়াত হয়েছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, অভিনেতা সঞ্জীব কুমার। শেষমেশ সেই একই দিনে, চলে গেলেন সুলক্ষণা। ১৯৫৪ সালের ১২ জুলাই ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে জন্ম সুলক্ষণার। নয় বছর বয়সেই শুরু হয়েছিল তাঁর সঙ্গীতযাত্রা। ১৯৬৭ সালে 'তকদীর' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে তাঁর প্রথম গান 'সাত সমন্দর পার সে' তাঁকে রাতারাতি পরিচিতি এনে দেয়। বলিউডের সেরা প্লেব্যাক গায়িকাদের মধ্যে জায়গা করে নেন তিনি। 'হেরা ফেরি', 'আপনাপন', 'খানদান', 'ওয়াক্ত কী দিওয়ার' ছবিতে রাজেশ খন্না, জিতেন্দ্র, শশী কপূর, বিনোদ খন্নাদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। ১৯৭৮ সালে উত্তমকুমারের সঙ্গে করেন 'বন্দী' ছবিটিও।



■ সুলক্ষণা পণ্ডিত



■ বিশ্বজয়ের ট্রোফি হাতে

বিশ্বজয়ী ভারত

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবারের জন্য একদিনের বিশ্বকাপ জিতল। তৈরি হল ইতিহাস। তবে এই জয় তৈরি করল এক অদ্ভুত সমাপতনের গল্প

ইতিহাস যে এইভাবে রচনা হবে, তা কে জানত! প্রথমবার একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জিতল হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন মহিলা ক্রিকেট দল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে গোটা দেশে অকাল দিওয়ালি উদ্‌যাপন করাল।

কিন্তু যে লড়াইটা গোটা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা জুড়ে চলল, তাতে এই মহিলা দলকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। কোনটা মনে রাখা হবে শেষ পর্যন্ত? শুধু ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার নাদিন ডি ক্লার্কের ক্যাচটা ধরার পর হরমনের বিজয় দৌড়?





■ প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হলেন দীপ্তি শর্মা



■ শেফালি ভর্মা ফাইনাল ম্যাচে হলেন সেরা



■ ম্যাচের পরে হরমনপ্রীত

নাকি সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৩৯ রান তাড়া করতে নেমে জেমাইমা রডরিগেজের একক লড়াই? রিচা ঘোষের বড় 'হিট'! নাকি অমনজ্যোত কওরের অল রাউন্ড পারফরম্যান্স! প্রতীকা রাওয়াল চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন বলে শেষ বেলায় সুযোগ পেলেন শেফালি বর্মা। তিনিও ফাইনালে ৮৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে এবং বিপক্ষের দুই উইকেট নিয়ে চলে গেলেন! সাদা চোখে দেখে মনে পারে, দলগত পারফরম্যান্স। কিন্তু এই টুকরো পারফরম্যান্সের কোলাজ আদতে জমে থাকা প্রত্যয়। ভারতের সোনার মেয়েদের এই প্রতিটি কীর্তি বিশ্বজয়ের পথটাকেই সুগম করেছে। লিগ স্টেজে পরপর তিনটি ম্যাচ হেরে



■ জয়ীদের উচ্ছ্বাস



■ হরমনের ক্যাচে দেশের বিশ্বজয়



■ দেশের পতাকা হাতে কোচ অমল মজুমদার

ছিটকেই যেতে বসেছিলেন হরমন, স্মৃতিরা। সেমিফাইনালে ওঠেন চতুর্থ দল হিসেবে। আর তারপরেই মোড় ঘুরিয়ে দেয় এমন কিছু প্রাণবন্ত পারফরম্যান্স। কনফিডেন্স বেড়ে গিয়েছিল হরমনদের। তাই তো কিংবদন্তি



■ হুইলচেয়ার নিয়েই মাঠে প্রতীকা। (নীচে) একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন হরমনপ্রীত ও স্মৃতি



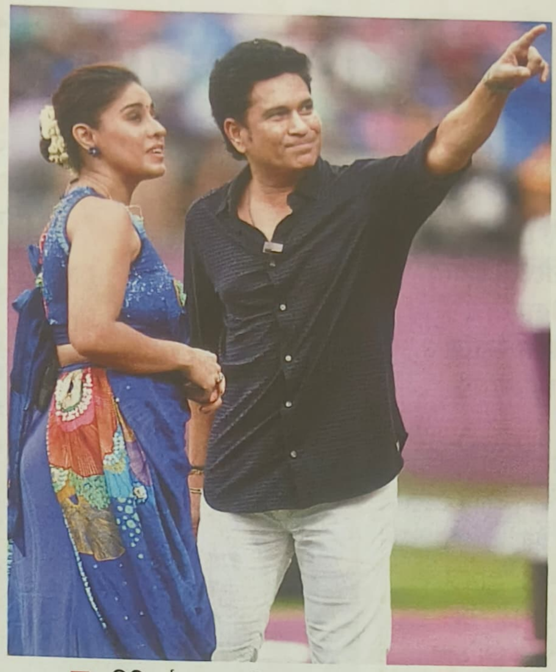
■ জয়ের কান্না স্মৃতির

ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, মিতালী রাজদের মাঠে এনেছিলেন বিশ্বজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এবং সেটা করলেনও। জয়ের পর মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ ভাবে বিশ্বজয়ের বিজয়োৎসব ভাগ শেষ কবে কোন দলকে করতে দেখা গিয়েছে, মনে পড়ে না। তবে মহিলা ক্রিকেট দলের এই অবিশ্বাস্য জয়েও থেকে যাচ্ছে এক অদ্ভুত সমাপতন। ২ এপ্রিল, ২০১১ সালে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ঐতিহাসিক ছক্কায়





■ গ্যালারিতে উপস্থিত রোহিত শর্মা, জয় শাহ, নীতা অম্বানী



■ সুনিধি চৌহান ও সচিন তেন্ডুলকর



■ সেমিফাইনালে জয়ের পর জেমাইমার কান্না



■ হরমনের উচ্ছ্বাস



■ ট্রোফিতে হাত, স্বপ্নপূরণ। (নীচে) দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্নভঙ্গের ছবি



ওয়াংখেড়েতে বিশ্বজয় ঘটেছিল ভারতের পুরুষ দলের। ২ নভেম্বর, ২০২৫ সালে ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে হরমনপ্রীত কৌরের দুরন্ত ক্যাচে প্রথমবার মেয়েদের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন! বিশ্বকাপ জয়ের চিত্রনাট্যে ফিনিশার হিসেবে থেকে গেলেন অধিনায়করাই। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!

কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ হয়ে শিল্পের

মুক্তি পেল তাঁর নতুন ছবি ‘রান্নাবাটি’। এর আগে ‘রঘু ডাকাত’-এর মতো কমর্শিয়াল ছবিতে কাজ করে কমফর্ট জ়োন থেকে বেরিয়েছেন তিনি। এর সঙ্গে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, তাঁর গায়ে রাজনৈতিক দলের তকমা লাগিয়ে দেওয়া, সব নিয়ে মুখ খুললেন **সোহিনী সরকার**। সামনে আসিফ সালাম



■ ‘রঘু ডাকাত’-এর লঞ্চে

প্র ‘রঘু ডাকাত’ দিয়েই সাক্ষাৎকার শুরু করি। এটি এমন একটি ছবি যেখানে আপনি কমফর্ট জ়োন থেকে বেরিয়ে অন্যভাবে নিজেকে প্রেজ়েন্ট করার চেষ্টা করেছেন। এর আগে ‘বিবাহ অভিযান’-এর মতো ছবিতে কাজ করলেও, ভরা নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দেবের গানে তো নাচেননি!

সে যা নাচ ছিল! তার উপর আমার পাশে ছিল ওম, যে একজন দারুণ ডান্সার। পরে আমি ওকে গিয়ে সরি বলেছি। অনেক সময়ে হয়, সহ-অভিনেতাকে গিয়ে আমরা বলি, আমার জন্য তোমার পার্টটা খারাপ হয়ে গেল... ওম অবশ্য খুব ভাল ছেলে। ও বলে, ‘তুমি খুব ভাল নেচেছ।’ আমি ভাবলাম, এটা ছাড়া ওর কাছে বলার আর অপশনও নেই!

প্র দর্শকরা আপনাকে যেভাবে দেখে অভ্যস্ত, ‘রঘু ডাকাত’-এর ক্ষেত্রে সেখানে একটা বিস্তর পরিবর্তন ছিল। নিজেকে এই বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল?

যে কোনও পেশাতেই আমরা এই চ্যালেঞ্জটা নিতে পছন্দ করি। এই যেমন ধরুন আপনি, টলিউডের সকলেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রায়। কিন্তু যদি গোয়ার পেন্টার মারিও মিরান্ডার ইন্টারভিউ নিতে হত? তাহলে একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা হত, তাই না? ছোটবেলায় আমি বাণিজ্যিক ছবি দেখেই বড় হয়েছি। আমি গোবিন্দার বিশাল ফ্যান। এখানে দেবের বিপুল ফ্যান ফলোয়িং, প্রোমোশনাল স্ট্র্যাটেজি, সব অন্য ধরনের ছিল...সব মিলিয়ে ভালই লেগেছে। অল বেঙ্গল টুর, নেতাজী ইন্ডোরে অত মানুষের সামনে ট্রেলার লঞ্চ... নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে তো ভালই লাগে।

প্র যাঁরা অন্যধারার ছবি করেন, তাঁদের অনেকেই বাণিজ্যিক ছবিকে ভাল চোখে দেখেন না। আপনি নিজে কোনও পার্থক্য খুঁজে পান?

সমান্তরাল ছবি বা বাণিজ্যিক ছবি শব্দগুলোয় আমার আপত্তি আছে। সমান্তরাল ছবিও আসলে গল্প বলা। আমি মানুষের গল্প কীভাবে বলছি, মানুষ সেই গল্পের সঙ্গে কতটা রিলেট করতে পারছে, সে নিজেকে ওই চরিত্রে দেখতে পাচ্ছে কি না...ছবিটা দেখে যেন মনে হয়, আমি তো এরকমই, বা এরকমই আমার মা-বাবা-জেঠিমা। সমান্তরাল ছবি দেখে আমি আমার জীবনযাপনের অনেকটা মিল খুঁজে পাই। আর বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে আমি যা হতে চাই, যেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে চাই বা কোনও কিছুর প্রতিবাদ করতে চাই...সেটা সেই গল্প বলে। আমার অ্যাসপিরেশনের গল্প। বাণিজ্যিক ছবি যদি বলিউডে দেখি একটা ফিক্সড ফর্ম্যাট আছে। একটা সময়ে ডাকাতের ছবি পরপর হয়েছে, তারপর এসেছে পুলিশের দুর্নীতি, তারপর আবার ভাল পুলিশ মানে ‘দবং’ বা ‘সিংহম’-এর মতো। প্যারালেল ছবিতে চরিত্র ঘুরে দাঁড়ায় না, যা দেখানো হয় তাই বাস্তব। বাস্তবে যে কষ্ট পায়, সারাজীবনই পায়। ঘুরে দাঁড়ানোর স্কোপও পায় না। ভারতের দর্শক সাধারণত বাণিজ্যিক ধরনের ছবি দেখতেই ভালবাসেন। মা যখন ঘুম পাড়ান, সন্তানকে গান গেয়ে ঘুম পাড়ান। প্রেমিক-প্রেমিকা গান গেয়ে প্রেম করেন। বাস্তবে কি আমরা তাই করি? তবে আমি দু’ধরনের ছবিই উপভোগ করি। কাজের ক্ষেত্রেও, দেখার ক্ষেত্রেও।

প্র ‘রঘু ডাকাত’-এর অফার পেয়ে প্রথমে কী রিঅ্যাকশন হয়েছিল? আর ছবিতে তো নায়িকা ইধিকা পাল, আপনি সহ নায়িকা। এটি ভাবিয়েছে?

দেব একদিন ফোন করে বলে, ‘রঘু ডাকাত’ বলে একটা ছবি করছে। ও আমাকে স্পষ্ট বলে দেয়, আমার নায়িকার চরিত্র নয়। কিন্তু চরিত্রটা গল্পের নিরিখে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেবের সঙ্গে এর আগেও দু’তিনটে ছবির কথা হয়েছিল। আমি না করেছিলাম, কারণ আমার চরিত্র পছন্দ হয়নি। আমি সব সময় দেখি, ছবিতে আমি কোনও রকমের দাগ কাটতে পারছি কি না। ‘রঘু ডাকাত’-এ দেব তো মলাট চরিত্রে, ফলে দেবকে আমি বলি, ‘এমন নয় যে নায়িকা হওয়ার খুব লোভ আছে। নায়িকা হলে মন্দ হয় না, তবে আগে চরিত্রটা শুনব।’ চরিত্র শুনে আমার পছন্দ হয়, লুকটাও পছন্দ হয়। ফাইট সিকোয়েন্স আছে, স্যাক্রিফাইস আছে।

প্র দর্শক হিসেবে ‘রঘু ডাকাত’-কে কত নম্বর দেবেন?

এই উত্তরটা এখনই দিতে পারব না। যদিও আমি নিজের ছবি নিয়ে বায়াসড নই। আমি নিজের কাজ ক্রিটিক্যালি দেখি। এই ছবি নিয়ে আমার প্রচুর বক্তব্য আছে। কিন্তু এখনই সেটা বলব না। ছবিটার পিছনে এত মানুষ এত এফর্ট

সঙ্গে আপস করতে পারব না: সোহিনী সরকার


ছবি: অভিজ্ঞান রায়

দিয়েছেন যে ছবিটা খারাপ হয়েছে, তা বলতে পারব না। এমন একটা জায়গা থেকে আমাকে বলতে হবে যেখানে নিজের ছবি বলে বায়াসড হব না, আবার দুর ছাই-ও করতে পারব না।

প্র এই ছবিতে নিজের কাজ দেখে কতটা তৃপ্ত আপনি?

নিজের কাজ তো আমার একদমই ভাল লাগে না। লোকজন প্রশংসা করেছেন। আসলে ভালর তো কোনও শেষ নেই...ফলে মনে হয়, শরীরী ভাষা আরও ভাল করতে পারতাম, যে ডায়লেক্টে কথা বলেছি, তা আরও ভাল হতে পারত। সর্বক্ষণ নিজের পিঠ নিজে চাপড়ালে হবে না। মানুষ এখন আর মুখের সামনে খারাপটা বলতে চান না। পিঠ চাপড়ানোর লোক প্রচুর।

প্র 'রান্নাবাটি' আপনার নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। এই ছবিতে রাজি হওয়ার তিনটে কারণ?

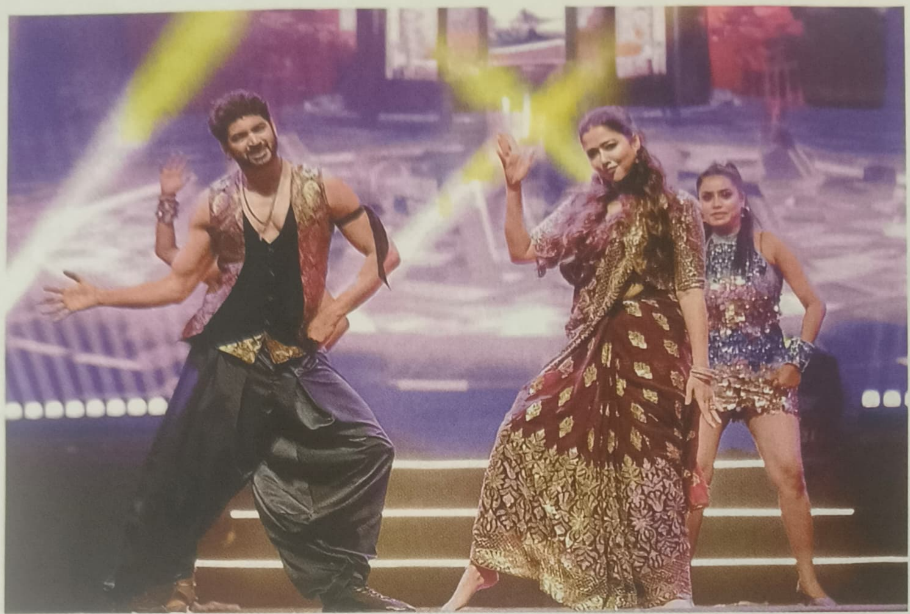
প্রথমত, পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত। ওঁর 'মাছের ঝোল', 'সাহেব বিবি গোলাম' দেখেছি।


'রান্নাবাটি' ছবির দৃশ্যে ঋত্বিক ও সোহিনী

অনেকদিন ধরেই কথা হচ্ছিল ওঁর সঙ্গে কাজের। প্রতিমদা একদিন নিজে থেকেই ফোন করে ছবির গল্প শোনান। এমনিতে আমাকে বেশিরভাগই পাশের বাড়ি মেয়ে, ডিগ্ল্যাম চরিত্রে দেখা যায়। কিন্তু এই ছবিতে আমি খুব গ্ল্যামারাস, ভাল কথা বলি। এরকম চরিত্র আগে করিনি। এছাড়া কারণ বলতে, ছবির গল্প আর ঋত্বিকদা (চক্রবর্তী)।

প্র সম্প্রতি মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সব নায়িকাকে দেখা গেলেও আপনাকে দেখা গেল না। কেন?

ভাইফোঁটা নিয়ে আমার সেই আবেগ নেই।



নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওমের সঙ্গে সোহিনীর নাচ

নিজের দাদা বা ভাই নেই। ছোটবেলা থেকে কাউকে ভাইফোঁটা দিইনি। মাসতুতো দাদা শিলিগুড়িতে থাকে। তার সঙ্গে কখনও ভাইফোঁটা হয়নি। ভাইফোঁটার দিন সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম, ঘুমিয়েছি। ছবির প্রোমোশনও ছিল না। আমি শাসক বা বিপক্ষ, কারওরই ঘনিষ্ঠ হতে চাইনি। কিছু কিছু কাজ কখনও কখনও করতে হয়েছে, যা হয়তো কোনও দলের পক্ষে। মহানায়ক সম্মান আমাকে দু'বার দেওয়া হয়েছে, আমি তা নিয়েছি এবং বাড়ি চলে এসেছি। আবার বিপক্ষের দল থেকে পুজো উদ্বোধনে ডাকলেও গিয়েছি। সাম্মানিক নিয়েছি, কথা বলেছি, বাড়ি চলে এসেছি। এর বাইরে কোনও দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাইনি। আমি একজন ইনডিভিজুয়াল মানুষ, আমার কিছু আদর্শ রয়েছে। আর শিল্পী নিউট্রালি থাকলে তার কাজ করতে সুবিধে হয়। কাজের মধ্যে দিয়ে কিছু বলার থাকলে বলব। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালে আমাকে অনেক কিছু নিয়ে কম্প্রোমাইজ় করতে হবে। সেটা নিজের শিল্পের ক্ষেত্রেও করতে হবে। আমি এই আপসটা করতে পারব না। দক্ষিণে প্রচুর সরকার বিরোধী ছবি হয়। এখানে আমি এরকম ছবি করতেই পারব না যদি কোনও সরকারের ঘনিষ্ঠ হই। দক্ষিণে বহু তারকা ছবি করেছেন, রাজনীতিও করেছেন। কিন্তু আমাদের এখানকার সাধারণ বাঙালি মানুষের সঙ্গে কথা বললে বুঝি, তাঁরা কোনও শিল্পীকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে দেখতে চান না। তখন একটা বায়াসনেস কাজ করে। আরজি করের পর অনেকেই আমাকে সিপিএম বা বিজেপির খাতায় ফেলে দিয়েছেন। সেটা তাঁদের ব্যাপার। আমি জানি, আমি কারও ঘনিষ্ঠ নই। যদি আবারও সুযোগ আসে, সব মানুষ রাস্তায় নামেন, আমিও যাব। তবে আমার অত সাহসও নেই একা গিয়ে প্রতিবাদ করার। একা বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর সাহস এখনও নিজের মধ্যে গ্রো করেনি।

প্র বেঙ্গালুরুতে বাঙালি তরুণীর উপর নির্যাতন, এসএসকেএম-এ নাবালিকার উপর নির্যাতন। মহিলা হিসেবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন?

আলাদা করে পুরুষ মহিলা বিভাজন করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। আজ যে ট্রান্সওম্যান আমার হেয়ার করতে এসেছে, এই যে মহিলাদের উপর নির্যাতনের কথা বলছেন... ট্রান্সজেন্ডারদের উপর নির্যাতনকে অনেকে সহজে মেনে নেন। ভারতীয় ভাষায় সে হিজড়ে, ফলে এটা হতেই পারে। আমার একটি ছেলে বন্ধু ছিল, গোলগাল চেহারা। তাকে বহুবার ট্রেনে, বাসে হেনস্থা হতে হয়েছে। আমরা নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে জন্মাই, আমাদের শরীরে প্রচুর ট্রমা। যতই পোশাকের দিক থেকে স্বাধীনতা আসুক, সোশ্যাল মিডিয়ায় যা ইচ্ছে লিখি...কিন্তু যেভাবে বড় হয়েছি, তাতে সত্যিই কি স্বাধীন? পুরুষ, মহিলা, কুইয়্যার নির্বিশেষে। আবার সঙ্গে প্রতিবাদও চলবে, মুখ বন্ধ করলে চলবে না। আমাকে অনেকেই বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেব কি না। ভাবছিলাম, এপিজে আব্দুল কালামের মতো কোনও মানুষ থাকতেন, যিনি কোনও দলের নেতা, যিনি শিক্ষার হাত ধরে উন্নতির কথা বলেন। এরকম মানুষ থাকলে তাঁর কাছে যেতাম, তাঁর দলে হয়তো যোগ দিতাম। এখন আদর্শ তৈরি হওয়ার মানুষই নেই!

প্র একটা সময় আপনার সঙ্গে তো অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের প্রেমের সম্পর্ক ছিল, তারপর আপনাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এখন আবার দেখা যায় আপনারা ভাল বন্ধু, একসঙ্গে কাজও করেছেন।

প্রথমেই বলি, আমার সঙ্গে অনির্বাণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল ২০১৩ সালে। তখন আমাদের



এক অনুষ্ঠানে স্বামী শোভন ও প্রসেনজিতের সঙ্গে

কারও কোনও পরিচিতি ছিল না। আমি আর ও 'কলকাতার কিং কোম্পানি' বলে একটা নাটকে অভিনয় করেছিলাম। সেখান থেকেই প্রেমের সম্পর্ক শুরু। কিন্তু মনে রাখবেন সালটা ছিল ২০১৩, তখনও আমার বিয়ে হয়নি। এখন আসলে এতকিছু নিয়ে ট্রোলিং হয় যে অনেকেই হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতে শুরু করবেন যে আমি আর অনির্বাণ এখন প্রেম করছি! বিচ্ছেদের পর আমাদের মধ্যে আবার কানেকশন হয় কাজের জন্যই। সেই সময়টা আমরা দু'জনেই অনেক ম্যাচিয়োরড। তাই আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রাধান্য পায় আমাদের কাজ। কাজের জন্য আমরা এক হই, প্রথমদিকে খুব বেশি কথা হত না। কিন্তু ধীরে-ধীরে আমরা সেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠি।

প্র অনির্বাণ যে এখন ছবির কাজ পাচ্ছেন না, এটা নিয়ে আপনি ওঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন?

এখানে কেউ কারও পাশে দাঁড়ায় না, নিজের লড়াইটা নিজেকে বুঝে নিতে হয়। আরজিকর-এর সময় আমি যখন রাস্তায় নেমেছিলাম তখন কিন্তু অনেকে পাশে দাঁড়ায়নি, তাই একইভাবে এখন অনির্বাণের এই লড়াইটা ওর একার লড়াই।

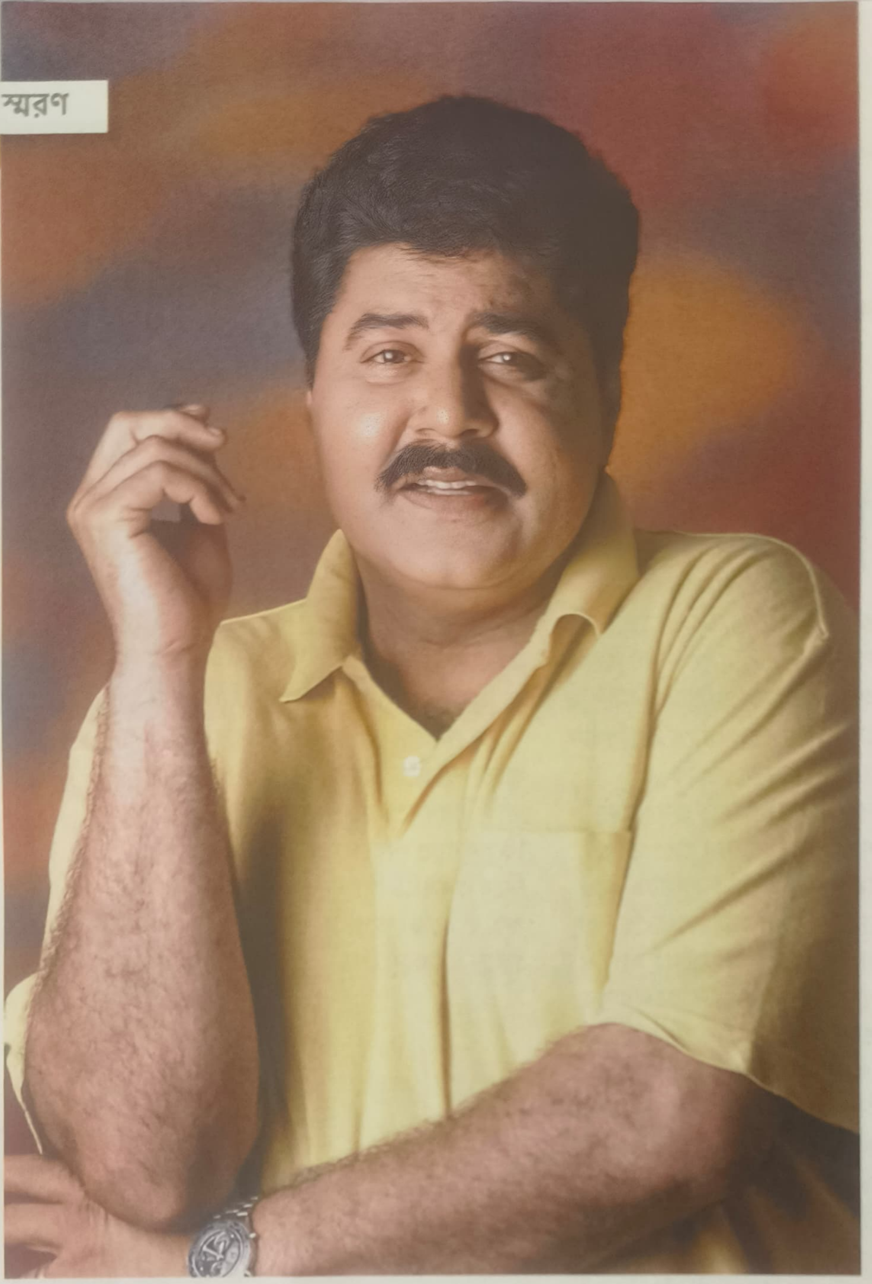
পার্টি ও মেকি হাসি

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

শীতকাল কবে আসছে সুপর্ণা? আমি আরও বেশি করে পার্টি করব! কারণ ফিল্মি পার্টি না হলে তো মেকি হাসি, মাপা হাসিগুলো চোখে পড়ে না। এই যে বুকে বিষ নিয়ে একে অপরকে দেখে ভাই বলে ঝাঁপিয়ে পড়া, রসসিক্ত ছলছল চোখে সব বিবাদ ভুলে যাওয়ার নাটক... এ কি এই তারাভরা আকাশের নীচে জমকালো মজলিশ ছাড়া দেখা সম্ভব হত? তবে সব সময় বোধ হয় মেকি হাসিতে কাজ হয়ও না। এখন সকলেই রণংদেহি। শুধু সেটা বাইরে প্রকাশ না পেলেই হল। এই দেখুন না, সেদিন ইন্ডাস্ট্রির ছাতাবাবুর বাড়িতে মা দুর্গা চলে যাওয়ার দুঃখে একটা পার্টি ছিল। সেখানে এক ছাতার তলায় সব সুজন একত্রিত হয়েছিল। এসেছিল তারাও, যারা পুজোর সময় নিজেদের ছবি মুক্তি নিয়ে একে অপরের দিকে তীক্ষ্ণ শলাকা নিক্ষেপ করেছে। এবার যদি তাদের একসঙ্গে ছবি তুলতে বলা হয়, নিমের পাঁচন গেলার মতো অবস্থা তো হবেই। এমনিতে মুখে হাসি বজায় রাখা যায় বটে, কিন্তু এবার বোধ হয় সেটা করতেও অপারগ হল রুদ্র আশীর্বাদ এবং প্রযোজক হাস্যময়। কিছুদিন আগেই তো নিজেদের ছবি নিয়ে একে অপরের প্রতি বিষোদ্গার করেছে তারা। বসন্ত উৎসবকে আটক করে অবধি রেখে দিয়েছিল। পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ পর্যায়ে যায়। এখন সব ভুলে যাওয়ার নাটক তো সম্ভব নয়। তাই নমো নমো করে ছবি তোলার পালা সাঙ্গ করে যেই না দু'জনে দু'দিকে গেল, আর পরে মুখোমুখি অবধি হল না।

আসলে তারা হওয়ার হ্যাপা অনেক। কত কী যে লুকোতে হয়। অভিনেতা সুবাসিত কি আর জানত তার বৌ দৃষ্টি তাকে না জানিয়ে একটা ক্যাফে খুলে ফেলেছে! অন্য সময় হলে, সে হয়তো আনন্দে আটখানা হত। কিন্তু এবার হল না। কারণ তার নিজের একটি ক্যাফে আছে যে! বৌ যে তলে তলে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে, তা কি সে জানত? তাই ভীষণ রাগ হলেও সুবাসিত মুখে কিছু বলতে পারছে না। বৌকে নিয়ে কনসার্টে গিয়ে নাচনকোদন করতে হচ্ছে। অথচ বুক তার ফেটে যাচ্ছে দুঃখে।





বিদায় ‘সারাভাই’

কৌতুকাভিনেতা হিসেবে দর্শকমনে জায়গা করে নিতে পারেন খুব কম মানুষই। অভিনেতা **সতীশ শাহ** ছিলেন সেদিক থেকে অনন্য। কোন খাতে বয়েছিল তাঁর পেশাজীবনের চার দশক? লিখছেন সাগরিকা চক্রবর্ত্তী

মজার দুনিয়ায় তাঁর আর এক নাম ‘সারাভাই’। শেষ কয়েক বছরে ‘সারাভাই ভার্সেস সারাভাই’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে কৌতুক জগতে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা সতীশ শাহ। টেলিপর্দার সেই জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যাওয়া অসম্ভব ঠিকই, কিন্তু বড়পর্দাতে তাঁর চরিত্রায়ণ কম কিছু নয়। শাহরুখ, সলমন, অমিতাভ এমনকি নাসিরুদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন সতীশ। নামিদামী তারকাদের মধ্যেও নিজের অভিনয়কে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতেন তিনি। ফারহা খান, রাকেশ রোশনের মতো পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন একাধিক ছবিতে। নায়ক না হয়েও অভিনেতা হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে।

মনে রাখার মতো

সতীশ বিনোদন জগতে কৌতুকাভিনেতা হিসেবেই পরিচিত। তবে তাঁর অভিনয়ের শুরু থিয়েটার থেকে। মঞ্চে সতীশের অভিনয় ছিল উপভোগ্য। সালটা ১৯৮৩। পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে সদ্য স্নাতক ডিগ্রি পেয়েছেন সতীশ। প্রথম ব্রেক ‘জানে ভি দো ইয়ারো’। তাঁর চার দশকের কর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি এটাই। সতীশের জীবনে মোড় ঘোরানো কাজ ছিল সোশ্যাল স্যাটায়ার ভিত্তিক এই ছবি। তবে সতীশের ভাল কাজের তালিকাটা আরও বড়। ঠিক তার পরের বছর থেকে সম্প্রচারিত হয় ‘ইয়ে জো হ্যায় জ়িন্দগী’ নামের একটি কমেডি শো। যেখানে ৫৫ টি পর্বে ৫৫ টি ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সতীশ। সলমনের কেরিয়ারের শুরু থেকে সঙ্গী ছিলেন। ভাইজানের প্রথম ছবি ‘ম্যায়নে পেয়ার কিয়া’ থেকে শুরু করে ‘হম আপকে হ্যায় কউন’, ‘হম সাথ সাথ হ্যায়’র মতো একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। ‘ম্যায় হুঁ না’ হোক বা ‘ভূতনাথ’, শিক্ষকের চরিত্রেও তিনি অনবদ্য।



■ ‘সারাভাই ভার্সেস সারাভাই’ ধারাবাহিকের সকলে

আফসোসের পাহাড়

তবুও আফসোসের পাহাড় জন্মেছিল সতীশের মনে। কোমল, শান্ত গোছের মানুষ তিনি। অসাধারণ কমিক টাইমিং। মুখে অমলিন হাসি। তবুও অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে বেশ সময় লেগেছে তাঁর। গত বছর এক সাক্ষাৎকারে সতীশ বলেছিলেন, “আমাকে দেখতে ভাল না। নায়কসুলভ কোনও কিছুই নেই আমার মধ্যে”। যে মানুষটা

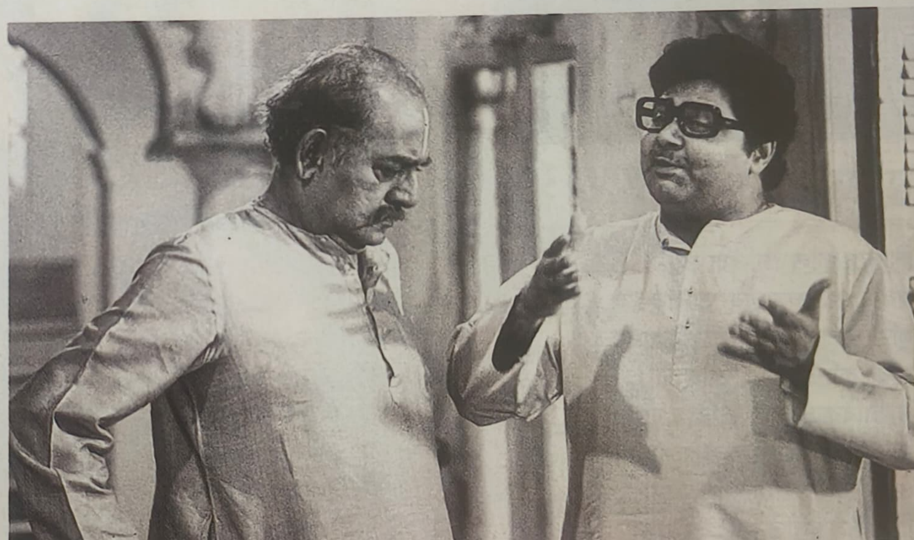


'অমৃত' ছবিতে সতীশ শাহ সঙ্গে শফি ইনামদার

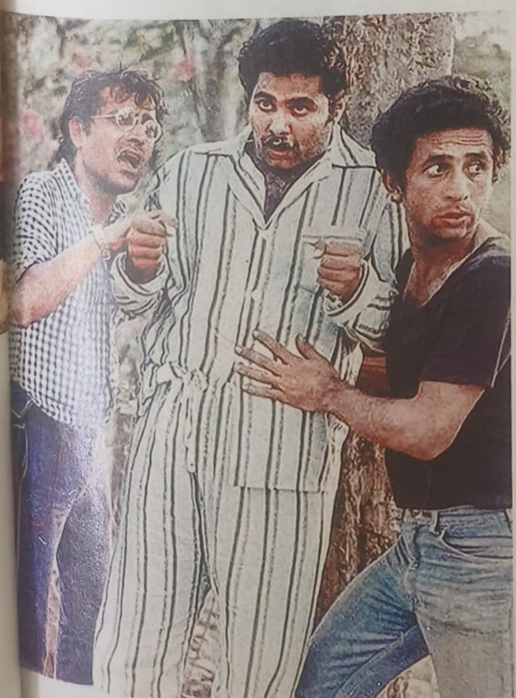
হয়ে অডিশন না দিয়েই তিনি ফিরে আসতেন। অথচ 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জয়েঙ্গে', 'কভি হাঁ কভি না'র মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে নানাবিধ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সতীশ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করতেন। যেমন তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রথম ছবি 'জানে ভি দো ইয়ারো'-তে তাঁর পারিশ্রমিক ছিল সামান্য। সেই টাকাও পেতেন কিস্তিতে। কখনও দিনে ৫০, কখনও ১০০। যদিও অর্থের জন্য আফসোস তাঁর ছিল না। ছিল চরিত্রের জন্য।

শেষ কয়েক বছর বেশ অসুস্থ ছিলেন তিনি। তবুও কাজে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিডনি প্রতিস্থাপন, বাইপাস সার্জারির পরও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে নিজস্বী তিনি সামজ মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন, সেটাই তার ইঙ্গিত। কমেডি চরিত্রে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। তবে তা শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবে নয়। বাস্তবেও হাস্যরসাত্মক মানুষ ছিলেন।

কমেডির জন্য দর্শকমনে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তিনি চিন্তিত থাকতেন শরীরের গঠন নিয়ে। শারীরিক গঠনের জন্যই ভাল কাজ পেতেন না সতীশ। প্রায়ই দুঃখ পেতেন এমন বিষয় নিয়ে। অভিনেতা হিসেবে কখনওই খুব সম্মান তিনি পাননি। এটা তাঁর নিজের অভিমত। ভাল জায়গায় পড়াশোনা করেছিলেন। সেই সূত্রে খানিক সম্মান পেতেন। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে কাজ পাওয়া তাঁর জন্য ছিল কঠিন। ইন্ডাস্ট্রি থেকে যথেষ্ট সম্মান হয়তো তিনি পেয়েছেন। কিন্তু শুধু কৌতুকাভিনেতা হিসেবে নিজেকে বেঁধে রাখতে নারাজ ছিলেন। আবার এও মানতেন, তাঁর গঠন বা ব্যক্তিত্ব, সবটাই কমেডি চরিত্রের সঙ্গে মানানসই।



তপন সিনহার ছবিতে উৎপল দত্তর সঙ্গে সতীশ শাহ



'জানে ভি দো ইয়ারো' ছবির একটি দৃশ্য

না পাওয়া, মেনে নেওয়া

চরিত্রের খোঁজে প্রযোজকদের কাছে পৌঁছে যেতেন সতীশ। প্রথমেই তাঁকে ক্যামেরার ওপারের মানুষ ভেবে ভুল করতেন প্রযোজকরা। অভিনেতা শোনামাত্রই চমকে উঠতেন। অনেক সময় এমন আচরণে হতাশ

কাছের বন্ধুদের মজার বার্তা পাঠাতেন সব সময়। তাই তো জীবনের শেষ দিনেও কাছের বন্ধু রত্না পাঠককে মজার ছলে বলেছিলেন, "শুধু আমাকে দেখলে বোঝা যায়, আমি বড় হয়েছি।" এ কথা একেবারে সত্যি। অসুস্থতা, প্রত্যাশা বরাবর সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর মন ভাল করা অভিনয়। মজার চরিত্রে অভিনয় করা বেশ কঠিন। মানুষকে হাসানোও কঠিন। অভিনয় জীবনের চার দশক ধরে সেই কাজই করে গিয়েছেন সতীশ। তাই দর্শকদের স্মৃতিতে থেকে যাবে তাঁর কাজ, তাঁর নাম।



মুক্তিতে বাধা

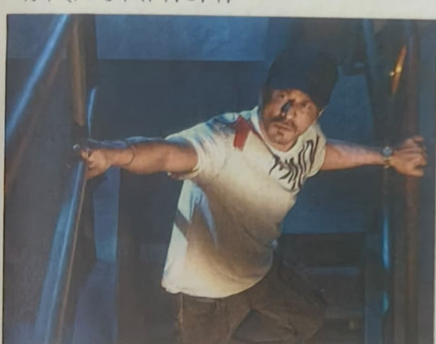
পিছিয়ে গেল আলিয়া ভট্ট-শবরী ওয়াঘের ছবি 'আলফা'র মুক্তি। স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারীকেন্দ্রিক ছবি 'আলফা'। স্বাভাবিকভাবেই তা নিয়ে যশরাজ ফিল্মস প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দর্শকরাও এই ছবিটির জন্য অপেক্ষায়। ঠিক ছিল চলতি বছর বড়দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি। কিন্তু ছবিটির ভিএফএক্সের কাজ এখনও বাকি। তাই প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী বছর এপ্রিলে মুক্তি পাবে ছবিটি। সিনেম্যাটিক দিক থেকে কোনও খামতি রাখতে চান না নির্মাতারা। তাছাড়া স্পাই ইউনিভার্সের আগের ছবিটি আশানুরূপ ফল না পাওয়ায়, চিন্তিত তাঁরা। আগের এডিটিংয়ে ভরসা না রেখে, আরও উন্নত মানের ভিএফএক্স দিয়ে সাজাতে চান ছবিটি। অপেক্ষাই এখন ভরসা।



আলিয়া, শবরী (ইনসেটে)

অধরা শাহরুখ

এবারেও জন্মদিনে অধরা কিং খান। মন্নতের মেরামতির কারণে সপরিবার আলিবাগের বাংলোয় থাকছেন শাহরুখ। কিন্তু মন্নতের বাইরে বাদশার জন্মদিনে ভিড় জমবে না, তা তো হয় না। এ দিন সকাল থেকেই মন্নতের বাইরে ভিড় জমতে থাকে। সবটা সামলাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় মুম্বই পুলিশকে। নির্দিষ্ট সময়ে আলিবাগ থেকে মন্নতের উদ্দেশে রওনাও দেন শাহরুখ। কিন্তু মন্নতের বাইরে আসার অনুমতি পাননি তিনি। গত বছরও ঠিক এই কারণে জন্মদিনে দেখা মেলেনি তাঁর। তবে ভক্তদের একেবারে নিরাশ করেননি কিং। ওই দিন বিকেলে একটি থিয়েটারে 'ফ্যান মিট অ্যান্ড গ্রিট'-এ দেখা মিলেছে শাহরুখের। সকল অনুরাগীর সঙ্গে হাত মেলান তিনি।



শাহরুখ খান

পরিচালক রণবীর

সহ পরিচালক হিসেবেই তাঁর কেরিয়ারের শুরু। তাই অভিনেতা রণবীর কপূর আবারও ফিরতে চান পরিচালনা এবং প্রযোজনায়। আরকে স্টুডিয়োজ়কে নতুন করে গড়ে তুলছেন রণবীর। পারিবারিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য ইতিমধ্যেই সেই কাজে হাত দিয়েছেন। প্রযোজক হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনটি ছবির চিত্রনাট্য। নিজের অভিনীত ছবির কাজ ছাড়াও এই কাজের জন্য বাড়তি সময় তুলে রাখছেন অভিনেতা। তিনটি ছবির মধ্যে একটির পরিচালনায় থাকবেন রণবীর নিজে। এছাড়া কিশোরকুমারের বায়োপিক প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবে আরকে স্টুডিয়োজ়। আর একটি ছবির দায়িত্বে থাকবেন অয়ন মুখোপাধ্যায়। তিনটির মধ্যে একটি ছবিতে অভিনয় করবেন দীপিকা পাড়ুকোন।

রণবীর কপূর



অমিতাভ বচ্চন

বচ্চনের সিদ্ধান্ত

দিন দিন তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিরাপত্তাও। এবার উল্টো পথে হাঁটলেন অমিতাভ বচ্চন। গত এক বছরে একাধিক সম্পত্তি কিনেছেন তিনি। এবার বিক্রিও করলেন। মুম্বইয়ের গোরেগাঁওয়ে দুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বিক্রি করলেন শাহেনশাহ। শোনা যাচ্ছে, আর্থিক লাভের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০১২ সালে প্রায় আট কোটির বিনিময়ে ফ্ল্যাট দু'টি কিনেছিলেন তিনি। চলতি বছরে ওই দুটি ফ্ল্যাট মোট ১২ কোটিতে বিক্রি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বড় অঙ্কের টাকা লাভ করেছেন। অনেকের অনুমান, অন্য কোনও সম্পত্তি কিনবেন তিনি। চলতি বছরের গোড়ার দিকে আন্ধেরির ফ্ল্যাটটিও বেচে দিয়েছেন বিগবি। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ যে শুধু শখ নয়, ভবিষ্যতের সম্বল, তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তারকারা।







ভিকি-ক্যাটরিনার মিষ্টি মুহূর্ত, সন্তান আগমনের বার্তা (ইনসেটে)

দুই থেকে তিনে তাঁরা

অভিভাবক হলেন ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ। এই বছরের সেপ্টেম্বরে সন্তান আগমনের খবর প্রকাশ্যে এনেছিলেন তাঁরা। তবে সেই খুশির খবর বেশ কিছুটা দেরিতেই জানিয়েছিলেন তারকা দম্পতি। কিন্তু সন্তান আগমনের খবর প্রকাশ্য আনতে বিলম্ব করেননি। ক্যাটরিনা মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান ভিকি। জানান পুত্র সন্তানের অভিভাবক হয়েছেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিকি লিখেছেন, "আমাদের খুশির কারণ চলে এসেছে"। এর আগে একাধিকবার খবর রটেছিল, মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা। অবশেষে সব জল্পনায় ইতি টেনে ৭ নভেম্বর তাঁদের ঘরে এল নতুন সদস্য।



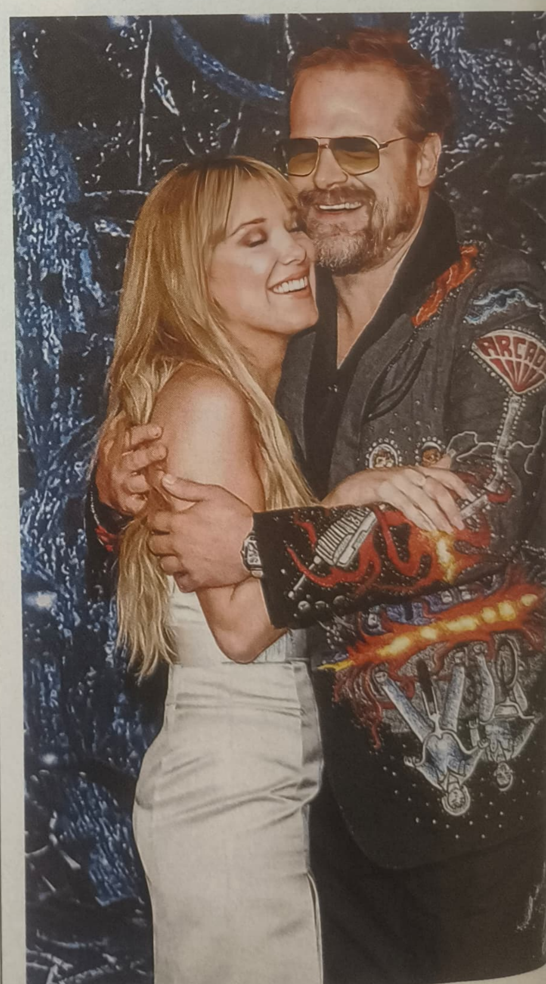
■ পেরি পিয়ারসন ও সোফি টার্নার। (ইনসেটে) ক্রিস মার্টিন

শেষ থেকে শুরু

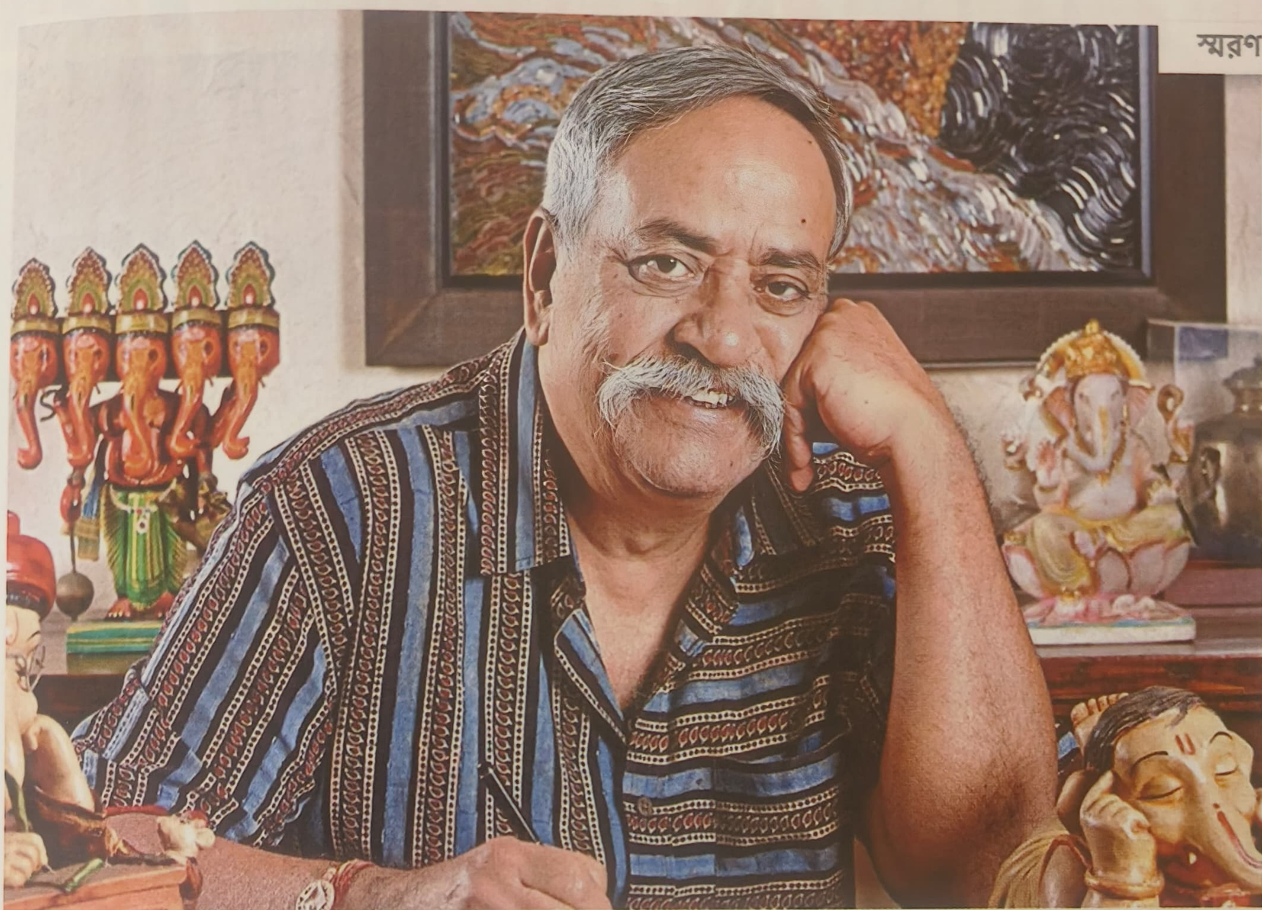
সোফি টার্নারের বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তী প্রেমজীবন দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। ব্রিটিশ ভাইকাউন্টের পুত্র পেরিগ্রিন পিয়ারসনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ২০২৩ থেকে। ফেব্রুয়ারি মাসে নিজের জন্মদিনে পেরির সঙ্গে ছবি দিয়ে সম্পর্কের কথা 'অফিশিয়াল' করেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সেই সম্পর্কে ইতি টেনে তিনি নাকি এখন 'কোল্ডপ্লে'র গায়ক ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে লন্ডনে কয়েকটি ডেট সেরে ফেলেছেন! ক্রিস তো ডাকোটা জনসনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সিঙ্গল! ওদিকে পেরিও কিন্তু চুপ করে বসে নেই! তিনি ভবিষ্যতের ভাইকাউন্ট বলে কথা। এক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে উন্মত্ত চুমুর ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ায় প্রমাণিত যে পেরি সোফির চেয়ে কম যান না।

এমনও হয়

'স্ট্রেঞ্জার থিংস' সিরিজ়টি যখন শুরু হয়, তখন মিলি ববি ব্রাউনের বয়স মাত্র ১০ বছর। সহ-অভিনেতা ডেভিড হার্বার, সেই শিশুকাল থেকে মিলিকে দেখছেন। শোনা যাচ্ছে, ডেভিড নাকি সিরিজ়ের পঞ্চম সিজ়নে এসে, মিলির সঙ্গে 'অসভ্যতা' করেছেন! মিলি নাকি উকিলের চিঠি পাঠিয়েছেন ডেভিডকে। অভিযোগ করেছেন সেটে 'বুলিং' এবং যৌন হেনস্থার। সেই কারণে আপাতত পঞ্চম সিজ়নের শুটিং স্থগিত রয়েছে। মিলি এখন যুবতী। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। ওটিটি-র বড় অভিনেত্রীও। ফলে কোনও রকম হেনস্থা চুপচাপ মেনে নিতে তিনি রাজি নন।



■ মিলি ববি ব্রাউন



পীযুষ: স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অমরত্ব দেওয়া অ্যাড-গুরু **পীযুষ পাণ্ডে** পরলোকে পাড়ি দিলেন

মধ্যবিত্ত ভারতীয়র কাছে সহনশীলতা মানে 'ফেভিকল', উদ্‌যাপন বলতে 'ক্যাডবেরি', বাড়ির প্রাণ বলতে 'এশিয়ান পেন্টস'। এক-একটি পণ্য ব্র্যান্ড এভাবে দেশবাসীর জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠল কী করে? বিজ্ঞাপন দুনিয়ার জাদুকর পীযূষ পাণ্ডের কারণে, যিনি বিদেশি ভাষা এবং সৌন্দর্যবোধ থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞাপনকে দেশের মাটির কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন।

জয়পুরে ন' ভাইবোনের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন পীযুষ। সৃজনশীলতা পরিবারের মধ্যেই ছিল (তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে চিত্রনির্মাতা প্রসূন পাণ্ডে ও গায়িকা ইলা অরুণ), ফলে রঞ্জি ট্রোফি খেলা পীযূষ দিল্লির সেন্ট স্টিভেন্স কলেজ থেকে ইতিহাস নিয়ে পড়ে শেষমেশ গেলেন বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় কাজ করতে। তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী, বিজ্ঞাপনের দুনিয়া 'লজিক'-এর পরিবর্তে 'ম্যাজিক' দ্বারা পরিচালিত হয়। নয়ের দশকে যখন ক্যাডবেরি কেবল বাচ্চাদের 'ট্রিট' হিসেবে পরিচিত ছিল, বাজারে সমস্ত চকোলেট ব্র্যান্ডকে বহু ক্রোশ পিছনে ফেলে দিয়েছিল তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত 'সোয়াদ জ়িন্দগী কা' বিজ্ঞাপন। বা এশিয়ান পেন্টসের 'হর ঘর কুছ কেহতা হ্যায়' বিজ্ঞাপনের কথাই ধরুন। বাসগৃহ যে আদতে মানুষের স্বপ্নের প্রতিফলন, তা প্রথম সামনে নিয়ে আসেন পীযুষ। এখন যত রঙের বিজ্ঞাপন, সব পীযূষের দেখানো মডেলেই তৈরি হয়। হাচ (বর্তমানে ভোডাফোন)-এর সেই 'ইউ অ্যান্ড আই' বিজ্ঞাপনে শুধু মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানি লাভবান হয়নি, পাগ-প্রজাতির সারমেয়র সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল দেশবাসী। আসলে পীযুষের কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। নয়ের দশকে পোলিও-আক্রান্ত কেসের ৫০ শতাংশ পাওয়া যায় ভারতে। পালস পোলিও টিকাকরণের বিজ্ঞাপনে অমিতাভ বচ্চনকে 'অভিভাবক' রূপে নিয়ে রীতিমতো ধমকে-চমকে বাড়ির শিশুকে 'দো বুঁদ জ়িন্দগী কী' খাওয়ানোর কাজটি করেছিলেন পীযুষ। আর যদি পীযূষের সবচেয়ে বড় কাজের কথা উল্লেখ করতে হয়, 'মিলে সুর মেরা তুমহারা' সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। এই গানের গীতিকার খোদ পীযুষ। ১৯৮৮-র স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার আগে দেখানো এই গানটি ভারতবর্ষের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের মূলমন্ত্রকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলে, তাতে গীতিকার পীযূষকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। ৭০ বছর বয়সে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে পীযুষ পরলোক গমন করেন ২৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ। তবে তাঁর তৈরি বিজ্ঞাপন এক-একটি ব্র্যান্ডকে গৃহস্থের নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে অমরত্ব দিয়েছে।



■ ২৭ বছর আগে শিবপ্রসাদ ও সুজন

সুজনের ডাকে মঞ্চে শিবু

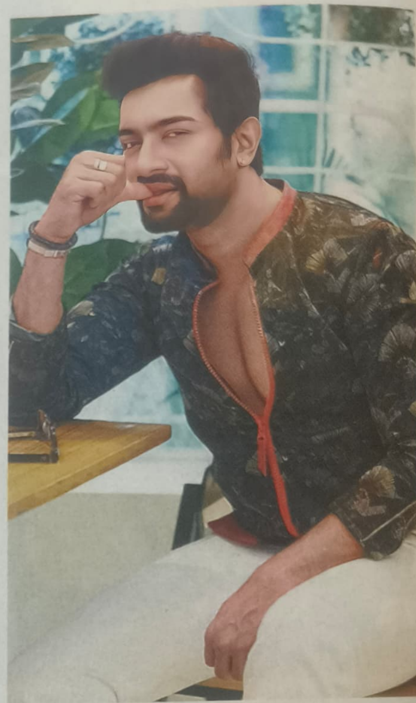
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ড্রামা ক্লাবে একসঙ্গে অনেক নাটক করেছেন শিবপ্রসাদ এবং সুজন মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে চেতনা থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে মঞ্চস্থ হতে চলেছে তাঁর 'ভুল রাস্তা' নাটক। সেই নাটকে অভিনয় করতে সুজন ডাক দিয়েছেন বন্ধু শিবপ্রসাদকে। কারণ ২৭ বছর আগে যখন সুজন চেতনার হয়ে এই নাটক পরিচালনা করেছিলেন, তখন শিবু অভিনয় করেছিলেন। আবার যখন চেতনা ফিরিয়ে আনছে 'ভুল রাস্তা', তখন শিবু কি আর বন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে পারেন? তাই ফের মঞ্চে ফিরছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চেতনার ৫৩তম জন্মদিন বলে কথা! সিনেমায় নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা শিবপ্রসাদ মঞ্চে মনজয় করবেন কিনা, সেটাই দেখার।

সরে দাঁড়ালেন পরম

কিছুদিন আগেই পিতা হয়েছেন তিনি। সন্তানের জন্মের আগে থেকে কিছুদিন পিতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। তারপর পুত্র নিষাদের দেখভালের জন্যও বাড়িতে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়েছেন। তাই কি এখনই সেটে ফিরতে চাইছেন না পরম? কারণ খবর হল, তাঁর হাত ধরে হইচই-তে যে 'ভাদুড়ি মশাই' সিরিজ় জনপ্রিয় হয়েছিল (প্রথমে 'পর্ণশবরীর শাপ' এবং পরে 'নিকষ ছায়া'), তারই তৃতীয় সংস্করণ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পরম। এই সিরিজ় পরিচালনা করবেন না তিনি। তাঁর বদলে হইচইয়ের হয়ে এই সিরিজ় পরিচালনা করবেন সায়ন্তন ঘোষাল। পরম নাকি এই সিদ্ধান্ত প্রযোজকদের জানিয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর প্রধান এবং প্রাথমিক কর্তব্য, ছেলের দেখাশোনা। যেহেতু হইচই-কে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সিরিজ়টি মুক্তি দিতে হবে, তাই পরম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



■ পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়



■ জিতু কমল

অসুস্থ জিতু

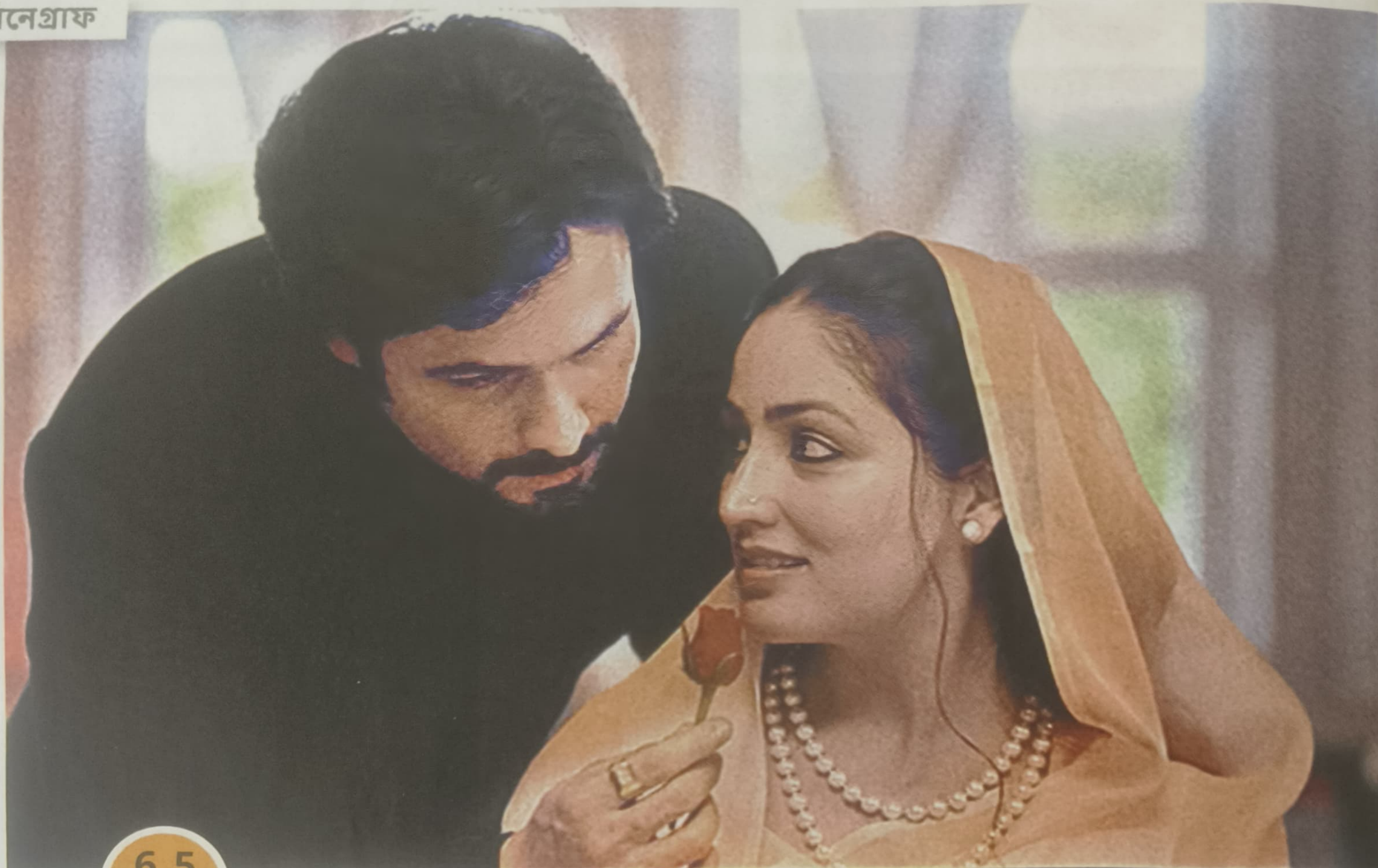
'এরাও মানুষ' ছবির শুটিং সেটে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা জিতু কমল। আগে থেকেই গায়ে জ্বর ছিল। শুটিং চলাকালীন হঠাৎ করেই বুকে ব্যথা শুরু হয়। অজ্ঞান হয়ে যান জিতু। সঙ্গে কাঁপতে থাকে শরীর। দ্রুততার সঙ্গে ধান্যকুড়িয়া থেকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। আপাতত সুস্থ আছেন অভিনেতা। তবে ডাক্তারদের পরামর্শ মতো এখনও হাসপাতালেই আছেন তিনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। একাধিক তারকা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। জিতুর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে এসেছিলেন শ্রাবন্তী। জিতুর জন্য উদ্বিগ্ন অনুরাগীরাও। তাই অভিনেতা এখন নিজেই তাঁর স্বাস্থ্যের আপডেট দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।



স্পিরিচুয়াল মানেই ধার্মিক নয়

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এসে নুসরত জাহান জানান তিনি মানুষ হিসেবে আধ্যাত্মিক এবং স্পিরিচুয়ালিটিতে বিশ্বাস করেন। তবে এর সঙ্গে নুসরত এও মনে করান যে, এর অর্থ এই নয় যে তিনি খুব ধার্মিক। স্পিরিচুয়ালিটি মানে নুসরতের কাছে নিজেকে জানা, নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাল দিক আর খারাপ দিক দুটোই আছে। আধ্যাত্মিক হওয়া মানে, নিজের পজ়িটিভ দিকগুলো বেশি করে তুলে ধরা আর নিজের খারাপগুলো ভিতরে চেপে রাখা। সেটা যেন বাইরে না আসে।

■ নুসরত জাহান



হক

6.5/10

অধিকার বুঝে নেওয়া...

পরিচালনা: সুপর্ণ ভর্মা

অভিনয়: ইমরান হাশমি, ইয়ামি গৌতম, শিবা চড্ডা, দনিশ হুসেন প্রমুখ

এক নারীর একক লড়াই, সে-লড়াই চলতে থাকে বছরের পর বছর, কেবল প্রাপ্য অধিকার, প্রাপ্য সম্মানটুকুর দাবিতে। তার জন্য সহ্য করতে হয় সমাজের অবমাননা, কেবল সেই মেয়েকেই নয়, তাঁর সন্তানদের, পরিবারের সদস্যদের। এবং অবশেষে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে ছিনিয়ে আনতে হয় 'হক', অধিকার। কেবল নিজের জন্য নয়, ভারতের অগণিত মুসলমান নারীদের জন্যও, যাঁরা কেবল তিন-তালাকের শিকার হয়ে বঞ্চিত হয়ে এসেছিলেন আর্থিক সুযোগসুবিধা থেকে। ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া শাহ বানো বনাম মহম্মদ আহমাদ খান-এর মামলাই হয়ে উঠেছে সুপর্ণ ভর্মা পরিচালিত 'হক' ছবির বিষয়বস্তু, শাজ়িয়া বানো (ইয়ামি গৌতম) আর আব্বাস খান (ইমরান হাশমি)-এর ধূসর প্রেমদ্বন্দ্বমুখর চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত চলেছিল শাহ বানোর লড়াই, এই মামলার জেরেই তৈরি হয়েছিল নতুন আইন—'মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ডিভোর্স) অ্যাক্ট, ১৯৮৬'। জিগনা ভোরা-র লেখা 'বানো: ভারত কি বেটি' গ্রন্থের তথ্যাদি থেকেই নির্মিত হয়েছে 'হক' চলচ্চিত্রটি। আব্বাস খানের দ্বিতীয় বিবাহের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় শাজ়িয়া বানোর লড়াই। কিন্তু তাঁর অধিকারের দাবির আড়ালে ছিল না কোনও অসূয়া কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা। তাঁর স্বামী সামান্য চারশো টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে যেতেই আদালতে যাওয়া স্থির করেন শাজ়িয়া। সব সময় পাশে থাকেন তাঁর বাবা (দনিশ হুসেন)। আর আদালতে পেয়ে যান দু'জন সংবেদনশীল উকিল, বেলা জৈন (শিবা চড্ডা) এবং ফরাজ় সইদকে (অসীম হট্টাঙ্গাডি)।'হক' কেবল উত্তর-প্রত্যুত্তরের কোর্টরুম ড্রামা নয়। শাজ়িয়া বানোর দুঃখকষ্ট, ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকা দাম্পত্য সম্পর্ক, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সমাজের কাছ থেকে অবজ্ঞা-অবহেলা ইত্যাদি সব কিছুই সূক্ষ্ম দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনেতারা। নেই আবেগের বাড়াবাড়ি কিংবা ধর্মীয় 'ঠিক'-'ভুল'-এর বিতর্ক। ছবি জুড়েই এসবের সুযোগ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু শাজ়িয়া বানো যেন বারবারই বলতে চেয়েছেন, 'আছি সংযত, প্রস্তুত'। স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি যেন জানতেনই, জয় তাঁর হবেই। অবশ্য এখানে একবচন যেন বেমানান, শাজ়িয়া এবং আরও অসংখ্য নারীর জয় একদিন আসবেই। ভরণপোষণ কোনও 'চ্যারিটি কেস' নয় (এই শব্দদু'টি অন্য প্রেক্ষিতে ছবিতে দেখানো হয়েছে বলেই অভিঘাতটি আরও জোরালো হয়), স্বামী সেটি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে দিতে বাধ্য। এটি কোনও দয়াদাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়। এই দাবিকেই আইনি শিলমোহর দিতে পেরেছিলেন শাহ বানো। সেই কাহিনি নতুন করে পর্দায় ফিরিয়ে এনে আরও একবার অতীতপাঠে উৎসাহিত করলেন পরিচালক। আয়নার মতো তুলে ধরলেন বর্তমানে।

শ্রী দুর্গা

4.5/10

থ্রিলারের অকালবোধন

পরিচালনা: সন্দীপ সাধী

অভিনয়: অপরাজিতা আঢ্য, জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, শোয়েব কবীর, ডোনা সাহা, পাপিয়া সেন, ভিকি নন্দী

বাংলা ছবিতে থ্রিলার, অ্যাকশন, রোমহর্ষক দৃশ্য তুলে ধরা কতটা কঠিন? প্রশ্ন করলে

উত্তর নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। কিন্তু সন্দীপ সাথীর 'শ্রী দুর্গা' ছবিতে সবেরই দেখা মিলবে। যুক্তি কতটা সঙ্গ দেবে, তা বিবেচ্য। ছবিতে এক মায়ের গল্প দেখানো হয়েছে। যিনি মা দুর্গার মতো দশভুজা। সংসার, স্বামী-সন্তান সব কিছু আগলে রাখেন। স্বামী শয্যাশায়ী। তাই সংসারের সব দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। রাজপ্রাসাদসম বনেদি বাড়িতে চারজন মাত্র লোক। সেই সুযোগেই ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে যায় আততায়ীর দল। এবং বাড়ির অন্দরে চলতে থাকে ভয়াবহ সব ঘটনা। প্রথমার্ধে গল্প বেশ ভালই লাগবে। সকলের অভিনয়ই বেশ যথাযথ। অপরাজিতা আঢ্যকে একেবারে অন্য রূপে দেখা যাবে এই ছবিতে। তাঁর অভিনয় দক্ষতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার থাকে না। এই ছবির মূলে তিনিই। অনেক দিন পর বাংলা ছবিতে জয়ের দেখা মিলল। কিন্তু তাঁর অভিনয় বড়ই মাঝারি মানের। থ্রিলার ছবির ভিলেন রূপে জয় নিজেকে ঠিক মেলে ধরতে পারেননি। তবে ভিলেনের চরিত্রে ভাল মানিয়েছে শোয়েবকে। এর আগে 'মির্জা' ছবির জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি। থ্রিলার ছবিও একপ্রকার মেকি লাগে এরকম গল্পের কারণে। চমকে দেওয়ার মতো চমক ছিল অবশ্যই। কিন্তু সেই বুনন আলগা হয়ে যায় শেষে। পরপর খুনের দৃশ্যগুলো রোমহর্ষক। কিন্তু কলকাতা শহরে আততায়ীর হামলা দিয়ে যে সিনেমা শুরু হয়েছিল, তার শেষটা ছন্নছাড়া। কোনও অন্তিম ফলাফল নেই। যে পুলিশরা সিনেমার শুরুতে তদন্তে নেমেছিল, শেষে তাদেরও দেখা নেই। 'শ্রী দুর্গা' নামটিকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ছবিতে। অবাস্তব স্বপ্নসম গল্প। তবুও শুরুর ভাগে থ্রিলার ছবিকে যথাযথ মান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। সে কথা অনস্বীকার্য।



রৈ রৈ বিনালে

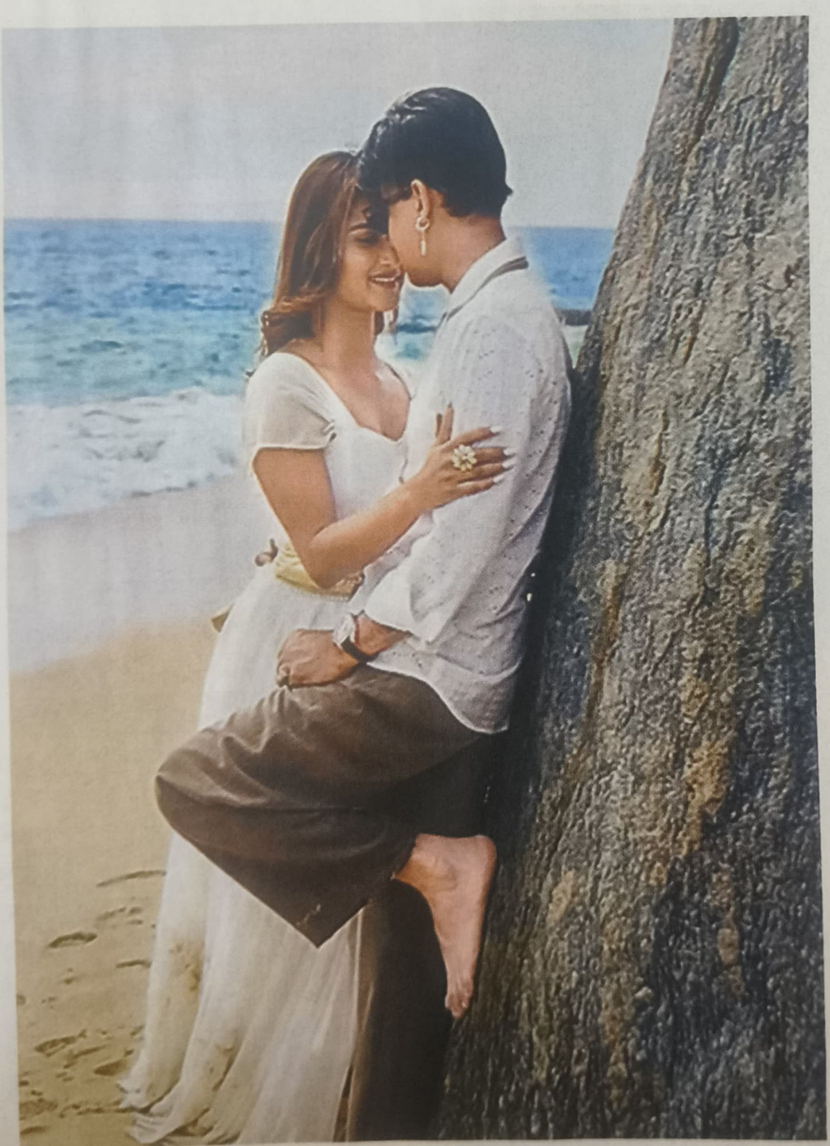
জুবিনকে শেষ শ্রদ্ধা

5/10

পরিচালনা: রাজেশ ভুইঁয়া
অভিনয়: জুবিন গর্গ, আচার্য বরপাত্র, জয় কাশ্যপ, মৌসুমী আলিফা, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

সফল বা জনপ্রিয় শিল্পী অনেকেই হন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রর মতো এমন উদারভাবে একটা গোটা রাজ্যের মানুষকে আগলে রাখেন কে? কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো এত স্পর্ধাই বা কোথায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা বলার? জীবিত জুবিন গর্গ ছিলেন লার্জার দ্যান লাইফ। চলে যাওয়ার পর তিনি দেখালেন, কীভাবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষ এক হয়ে কাঁদতে পারে। ফলে, তাঁর শেষ ছবি 'রৈ রৈ বিনালে' নিয়ে যে আবেগ ও উন্মাদনার ঢল নামবে, তা স্বাভাবিক। তিনি নিজেই একাধিক জায়গায় বলেছিলেন যে, এটি তাঁর স্বপ্নের প্রজেক্ট, প্রায় ১৯ বছর আগে থেকে পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এবং, এই ছবি হতে চলেছে অসমের প্রথম মিউজ়িক্যাল। ছবির গল্পের কেন্দ্রে এক দৃষ্টিশক্তিহীন শিল্পী রাউল (জুবিন গর্গ)। কিন্তু ছবির সংলাপে, দৃশ্যে ও মননে যেন সদাসর্বদা উঠে এসেছে জুবিনের নিজস্ব জীবনদর্শনের টুকরো ছবি। ছবির শুরুতে একটি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে গাইতে অস্বীকার করে বেরিয়ে যায় রাউল। এ তো চেনা ছবি... কখনও বিহুর মঞ্চে হিন্দি গান না গাওয়ার ফতোয়া অগ্রাহ্য করে তিনি মঞ্চ ছেড়ে চলে যান, কখনও ক্যান্সার আক্রান্ত একটি মেয়ের মৃত্যুসংবাদ (জুবিন তাঁর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন) শুনে মঞ্চে কেঁদে আর গাইতে পারেননি। ছবির কনটেক্সট আলাদা, কিন্তু দর্শন এক! আবার দৃষ্টিশক্তিহীন রাউলকে সাংবাদিকরা অপমানজনক প্রশ্ন করলে, সে ভণ্ডুল করে দেয় সাংবাদিক সম্মেলন। বলে, 'আমি অন্ধ নই, আই অ্যাম অ্যান আর্টিস্ট।' এও খুব চেনা ছবি। সংবাদিকদের অসম্মানের জবাবে বাস্তবে হোটেলে ভাঙচুর চালিয়েছিলেন তিনি, এক বছর ব্যানও করেন সাংবাদিকরা। পরে তা উঠে যায়। তবে সিনেমার সবচেয়ে মনে রাখার মতো সংলাপ বোধহয় জুবিনের জীবনদর্শনের সমার্থক... 'শিল্পীর একটাই রাজনীতি, সাধারণ মানুষের পাশে থাকার। রাজার সঙ্গে থাকার নয়।' গোটা জীবন দিয়ে বোধহয় এই সংলাপকে বাস্তব করে গিয়েছেন তিনি। সিনেমা হলে পাশে বসা মহিলা চোখ

মুছে যখন বললেন, 'আমরা জানতাম পৃথিবীর সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও, জুবিনদার দরজা খোলা আছে', তখন মনে হয় এতটাও কেউ দিতে পারে? ছবিতে রাউলের সমসাময়িক গায়ক হিসেবে রয়েছে নীর (জয় কাশ্যপ)। তাদের দু'জনকে নিয়ে একটি ব্যান্ড তৈরি করার ভাবে মৌ (মৌসুমী আলিফা)। গান, শিল্পী জীবন, নানা ঘাত-প্রতিঘাত মিলিয়ে গল্প এগোয়। রাউল বলে, 'পয়সার জন্য আমি গাই না।' এও জুবিনের জীবন দর্শন... তিনি নিজেই বলেছেন শো করার পর যত লাখ টাকাই উপার্জন হোক না কেন, যতক্ষণ না তা বিলিয়ে দিতে পারছেন, শান্তি নেই! রাউলের জীবনে একজন মেন্টর আছে ছবিতে, ভিক্টর (ভিক্টর)। প্রসঙ্গত উঠে আসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আলফা সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ। ছোটবেলায় স্কুলে এক বোমা বিস্ফোরণে দৃষ্টিশক্তি হারানো রাউল বলে, 'মানুষ মারার বিপ্লব আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে।' রাউলের হাতে গিটার তুলে দেয় ভিক্টর...এভাবেই গানের মাধ্যমে জগৎ দেখতে শুরু করে সে।
তবে ছবির সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এর গান। টাইটেল সংয়ের সুর ও লেখনী অসমান্য। বাকি গানগুলিও প্রাইম টাইমের জুবিনকে মনে করায়। ছবিটির ভুলত্রুটি খুঁজতে বসা খুব একটা জরুরি নয় এখন আর। কারণ, যে মানুষটি একা হাতে অসমের গান ও সিনেমাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে, তাঁর প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ না করে উপায় কী! তবে হ্যাঁ, ছবি হিসেবে দেখলে এটি সাধারণ হয়েই থেকে যায়। শুধু আবেগ জড়িয়ে থাকে, এই যা।



গণশত্রু

অভিনব অ্যানথোলজি

অভিনয়: পাওলি দাম, কিঞ্জল নন্দ, আয়ুষ দাস, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত, রুদ্রনীল ঘোষ

6/10

পরিচালনা: শমীক রায় চৌধুরী, অভিরূপ ঘোষ, মধুরা পালিত, সায়ন দাশগুপ্ত, শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত

সজল বাড়ুই, কামরুজ্জামান সরকার, ত্রৈলোক্য তারিণী, রাশিদ খান, হুব্বা শ্যামল... স্বাধীনতার শুরুর সময় থেকে বিভিন্ন সময় বাংলায় কিছু রক্তাক্ত উপাখ্যান লিখেছেন কুখ্যাত কিছু মানুষ। সংবাদপত্রের শিরোনাম ব্যস্ত থেকেছে তাঁদের নিয়ে। শিরোনামের চেয়েও বেশি ব্যস্ত থেকেছে প্রশাসন, এই মানুষগুলোকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য বা খুঁজে পাওয়ার জন্য। জি ফাইভের এই নতুন সিরিজ় বাংলার বাছাই করা পাঁচজন দুষ্কৃতির উপাখ্যান তুলে এনেছে 'গণশত্রু'র মাধ্যমে। পাঁচটি এপিসোড পাঁচজন এমন কুখ্যাত আসামিকে নিয়ে। পাঁচজন ভিন্ন পরিচালক। অভিনয়েও আলাদা আলাদা শিল্পীরা। এই অ্যানথোলজি প্রশংসার দাবি রাখে, কারণ এটি স্বল্প পরিসরে এই দুষ্কৃতিদের এবং বাংলার অস্থির সময়কে চিনিয়ে দেয়। তিরিশ মিনিটের কাছাকাছি এক একটি এপিসোডের দৈর্ঘ্য। প্রতিটিই রিল এবং রিয়েলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছে এবং ডকু ফিকশন হিসেবে উঠে এসেছে। মুশকিল হল, এই এপিসোডগুলির স্বল্প পরিসর। শুধু দুষ্কৃতীদের সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে পরিচালকদের। খুব বেশি গভীরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। তাতে সজল বাড়ুই (আয়ুষ) বাবা মাকে খুন করা ছাড়াও আর কী কী অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে, তা শুধু সংলাপের মধ্যেই থেকে যায়। চেনম্যান কামরুজ্জামানের গল্প বেশ উপর উপর। তাও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই, কৌতূহলের একটা দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। এপিসোড হিসেবে প্রতিটি বেশ টানটান। বিশেষ করে ভাল লেগেছে বাংলার প্রথম মহিলা সিরিয়াল কিলার ত্রৈলোক্য তারিণী ও হুব্বা শ্যামলের পর্ব দু'টি। অবশ্য তার প্রধান কারণ রুদ্রনীল ঘোষের দুর্দান্ত অভিনয় ও পাওলি দামের চোখের ব্যবহার। ত্রৈলোক্যর ক্ষেত্রে

সংলাপের ব্যাপারে আর একটু যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। সজল বাড়ুইয়ের এপিসোডটি দেখতে বেশ ভাল লাগল। শুধু অভিনয় এই এপিসোডের প্রধান অন্তরায়। এবং মনে হয়েছে, সজলকে ভিকটিম হিসেবেই দেখানো হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে বলা যায়, এই সিরিজ় দেখা উচিত। অভিনবত্ব এই সিরিজকে ভিন্ন মাত্রা দেয়।





অনুসন্ধান

অনুসন্ধানের নেপথ্যে

পরিচালনা: অদিতি রায়
অভিনয়: শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, সাগ্নিক, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়, হানি বাফনা, অরিত্র দত্ত বণিক

4.5/10

সত্যের সন্ধানে সাংবাদিক অনুমিতা সেন (শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়)। মেয়েদের জেলের ভিতর প্রেগন্যান্ট হয়ে যাচ্ছে একাধিক মেয়ে। জেলবন্দি মন্ত্রীর (সাহেব চট্টোপাধ্যায়) সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া সাংবাদিকের চোখ এড়ায়নি সেই দৃশ্য। তাই জেলে থেকেই সত্যের অনুসন্ধান শুরু করেন তিনি। কীভাবে জেলে যান, কীভাবে অনুসন্ধান করেন, কোন খাতে বয়ে চলেছে একজন সৎ সাংবাদিকের জীবন, সেই সব নিয়েই শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ওয়েব সিরিজ় 'অনুসন্ধান'। আলিপুর জেল মিউজ়িয়মের ভিতর সিরিজ়ের বেশিরভাগ অংশের শুটিং হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তা দেখতে বেশ ভাল লাগে। কারাগারের অন্দরের নানা দৃশ্য বেশ ভাল ভাবে গড়ে তোলা রয়েছে। কিছু কিছু জায়গা বেশ বাস্তবসম্মত। কিন্তু চিত্রনাট্যে ছন্দপতন হলে, তা আশানরূপ ফল পায় না কখনও। তা সে সিরিজ় হোক, বা সিনেমা। এই সিরিজ়ের গল্পে সব থাকলেও, চিত্রনাট্যের বাঁধন বড় আলগা। হাজার প্রশ্ন নিয়ে শুরু হলেও, সেই সব উত্তর থেকে যায় অধরা। কারাগারে মেয়েদের গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার ঘটনা মোড় নেয় নারী পাচারের মতো ঘটনায়। কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটা সম্পর্কিত নয় কোনওভাবেই। অতর্কিতে আক্রমণের দৃশ্যগুলো অবশ্যই চমকে দেয়। কিন্তু সেখানে ফিকে সংলাপ ও অদ্ভুত অভিনয় নিয়ে হাজির হন সোহিনী সেনগুপ্ত, যা একেবারে অর্থহীন। একাধিক চরিত্রের সমাগম সিরিজ়ে। কিন্তু কারওর অভিনয়ই যেন মন ছুঁতে পারে না। মুখ্য চরিত্রের মুখে সারহীন সংলাপ, অধিক অভিব্যক্তি না থাকলে হয়তো মানাত। শব্দের প্রয়োগ নিয়ে আরও সংযত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সিরিজ়, তার অন্দর খননের প্রয়োজন ছিল আরও।

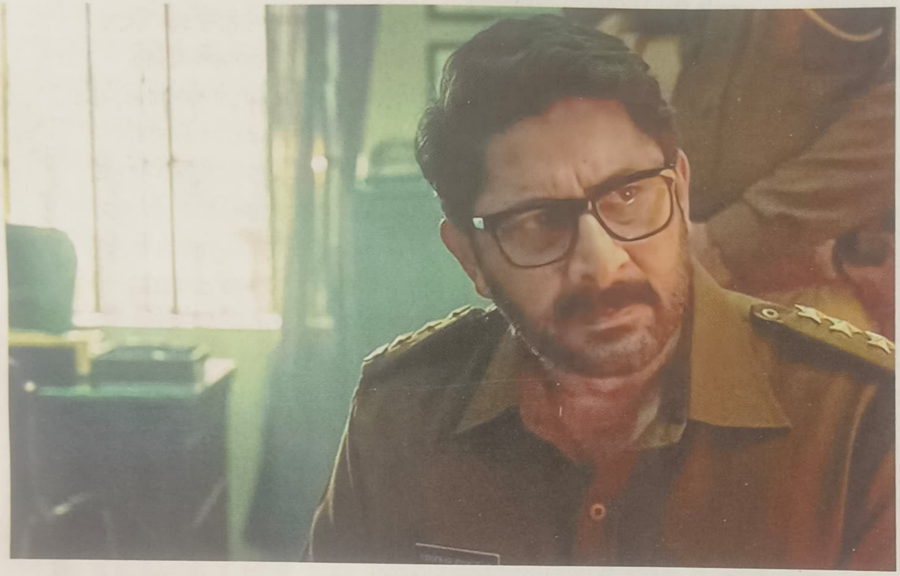
ভাগওয়াত চ্যাপ্টার ১: রাক্ষস

অন্যরকম, কিন্তু চমক কই?

পরিচালনা: অক্ষয় শেরে
অভিনয়: আরশাদ ওয়ারসি, জিতেন্দ্র কুমার, আয়েশা কাদুসকর

5.5/10

'ভাগওয়াত চ্যাপ্টার ১: রাক্ষস' একটি সত্যি ঘটনার উপর অবলম্বন করা ওয়েব ফিল্ম। সচরাচর আমরা যে সমস্ত সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে তৈরি হওয়া ওয়েব সিরিজ় বা ফিল্ম দেখে অভ্যস্ত, এই ছবিটি তাদের চেয়ে অনেকটা আলাদা। এখানে যে ক্রিমিনাল, তাকে খুবই সরল একজন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একজন সৎ পুলিশ অফিসার, যাকে শাস্তিস্বরূপ উত্তর প্রদেশের এক পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে বদলি করা হয়। তার উপর দায়িত্ব পড়ে সেই অঞ্চলে মেয়েদের উধাও হয়ে যাওয়ার কেসটা হ্যান্ডেল করার। এমন একটা পরিস্থিতি দাঁড়ায়, যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটে আবার এক নিচু জাতির শিক্ষক সমীর (জিতেন্দ্রকুমার) এবং উচ্চবর্ণের মেয়ে মীরার (আয়েশা) প্রেমের গল্প আগুনের আঁচ আরও বাড়িয়ে দেয়। গোটা ফিল্মে সারপ্রাইজ় এলিমেন্ট বলে কিছু নেই, তবে গোটা ছবিটিকে খুবই রিয়্যালিস্টিক টাচ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রোডাকশন ডিজ়াইনিংয়ের আলাদা করে প্রশংসা করতেই হবে যেখানে উত্তরপ্রদেশের একটি ছোট অঞ্চলকে তৈরি করা হয়েছে। এই ছবির আর একটা শক্তিশালী দিক হল এর সঙ্গে যুক্ত অভিনেতাদের তুখোড় অভিনয়। আরশাদের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না। জিতেন্দ্রকেও খুব ভাল লাগে, আয়েশা মানানসই। গোটা ছবি জুড়ে একটা অস্থিরতা আছে, একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আছে, যার জন্য ক্যামেরার কাজের প্রশংসা করতেই হয়। তবে হ্যাঁ, এরকম বিষয় নিয়ে তৈরি হওয়া অন্য ছবিগুলোর চেয়ে এটা আলাদা হলেও, গল্পে সেরকম কোনও টুইস্ট নেই।



হাউজ় অফ ডায়নামাইট

ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি

পরিচালনা: ক্যাথরিন বিগেলো
অভিনয়: ইড্রিস অ্যালবা, রেবেকা ফার্গুসন, ট্রেসি লেটস

6.5/10

আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ের বিষয় কী? নিঃসন্দেহে পারমাণবিক যুদ্ধ। যুদ্ধময় দুনিয়ায় কে কখন পরমাণু বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেবে, সেই আতঙ্ক অন্তরে বসবাস করে। কিন্তু ম্যানহাটন প্রজেক্টের ইতিহাস বাদ দিলে, স্যাটায়ার ছাড়া কোনও ছবি তৈরি হয় না। এমন একটি ছবি 'হাউজ় অফ ডায়নামাইট', যেখানে হঠাৎ একটি পরমাণু বোমা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শিকাগোর দিয়ে ধেয়ে আসে। পরমাণু আতঙ্কের বিল্ড-আপ হয় হোয়াইট হাউজ়ের প্রেসিডেন্সিয়াল ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টারে। কেউ যুদ্ধ করে না। কিন্তু চিন্তিত মুখের শট দেখে আতঙ্কের অনুমান করা যায়। ইন্টেলিজেন্স অফিসার অলিভিয়া ওয়াকারের ভূমিকায় অভিনয় করেছে রেবেকা ফার্গুসন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রনাট্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, সেই সঙ্গে ট্রেসি লেটসকেও বেশ ভাল লাগে। আসলে আলাদা করে কোনও অভিনেতার কথা উল্লেখ করার মানেই হয় না, কারণ এই ছবিটি একটি 'নিউক্লিয়ার অ্যাপোক্যালিপ্স'-এর ছবি। এখানে আতঙ্ক এবং অনাসৃষ্টির আবহ তৈরির কাজ ছবির চিত্রনাট্য এবং দৃশ্যগ্রহণের মাধ্যমেই তৈরি হয়ে যায়। একদল তরুণ নেভাল, এয়ারফোর্স, ইন্টেলিজেন্স অফিসার প্রাণপাত করে দেশকে বাঁচানোর জন্য এবং প্রবীণরা বুঝিয়ে দেন, এমন দিনের আশঙ্কা আগেই তৈরি হয়েছিল। ছবিটি টাইমলাইন নিয়ে খেলে। অতীত এবং বর্তমান তো বটেই, ভৌগলিক অবস্থান বদলাতে থাকে দৃশ্যের কাটা-কাটা বুননে। হয়তো এমন দৃশ্যের মাঝেই হঠাৎ হোয়াইট হাউজ়ে দেখা যায় আব্রাহাম লিঙ্কনের মূর্তি। ছবিটির নির্মাণে স্মার্টনেস ধরে রাখতে জাম্পকাট মাঝে মধ্যে ধাক্কা দেয়, কিন্তু সেটাই হয়তো ক্যাথরিনের উদ্দেশ্য ছিল।

